৮.০৮ বনহুর ও মাদাম বাঈ (১) – Bangla Library

৮.০৮ বনহুর ও মাদাম বাঈ (১) – Bangla Library

বনহুর ও মাদাম বাঙ্গী (১)–১২৮

নতুন এক জাহাজে হামলা চালালো জলদস্যু চিয়াংচু। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক জাহাজ, সে জাহাজে কোনো মালামাল ছিলো না, শুধু কোন রাজ-পরিবার তার গন্তব্যস্থানে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আক্রমণে রাজ-পরিবার হকচকিয়ে গেলেন। তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছিলেন। গভীর রাতে ভীষণ আর ভয়ংকর চিৎকারে জাহাজের সবাই জেগে উঠলো। মার মার কাট কাট শব্দ, তার সঙ্গে রিভলভারের গুলীর শব্দ, ছোরা-চাকুর ঝনঝন আওয়াজ!

সবার সঙ্গে বনহুরও ঐ জাহাজে লাফিয়ে পড়লো।

চিয়াংচুর দলবল যখন হত্যা আর লুটতরাজ শুরু করেছে তখন বনহুর সব লক্ষ করছে। চিয়াংচুর মন রক্ষার্থে সে এতদিন চুপ ছিলো এবং মাঝে মাঝে লুটতরাজে সহায়তা করতো। বনহুরের শক্তির পরিচয় পেয়েছিলো চিয়াংচু, তাই তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা সমীহ করতো, বনহুরের মত একটি অনুচর যদি তার দলে থাকে তাহলে অনেক অসাধ্য কাজ সমাধা করা সম্ভব হবে।

মাঝে-মধ্যে চিয়াংচু বনহুরকে নিয়ে আড্ডা জমানোর চেষ্টা করত। হইহুল্লোড় আর মদের নেশায় মেতে উঠতো চিয়াংচু।

আজ যখন চিয়াংচুর দর রাজপরিবারের লোকজন দেখা করছিলো তখন বনহুর স্থির থাকতে পারলো না, সে পেছন থেকে একজন অনুচরকে ধরে শূন্যে তুলে নিলো, তারপর ঝপাং করে ফেলে দিলো সমুদ্রের পানিতে।

এ দৃশ্য লক্ষ করলো চিয়াংচু।

সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, দলবলকে ইংগিত করলো বনহুরকে পেছন থেকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলতে। সঙ্গে সঙ্গে চিয়াংচুর দলবল আক্রমণ করলে, সবাই ধরে ফেললো বনহুরকে। শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো পিছমোড়া করে।

বনহুর তেমন প্রস্তুত ছিলো না, তাই তাকে এভাবে বেঁধে ফেলতে পারলো চিয়াংচুর দল। একচুলও যেন নড়তে না পারে সেইভাবে বাঁধলো ওরা।

ঠিক সেই সময় কয়েকজন অনুচর রাজা ও রাজ-কন্যাকে বেঁধে টেনে নিয়ে চললো তার সামনে দিয়ে।

লুটের মালের সঙ্গে রাজা ও রাজকন্যাকেও তার জাহাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো দলপতি চিয়াংচুর।

বনহুর আরও লক্ষ করলো শুধু যে রাজা ও রাজকন্যাকেই ওরা ক্ষতবিক্ষত দেহে বেঁধে নিয়ে চললো তাই নয়, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগলো বিনা কারণে। বনহুরের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো, তার হাত পেছন দিয়ে শক্ত করে বাঁধা না থাকলে সে একবার ওদের দেখে নিতে কিন্তু আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে আক্রমণ চালিয়ে আটক করা হয়েছে।

তীব্র আর্তনাদ আর কান্নার শব্দে গভীর রাতে সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ হলো। জমাট অন্ধকারে চিয়াংচুর অনুচরদের হাতের মশাল জাহাজখানাকে ভয়াবহ এক আলোকে আলোকিত করে তুলেছে।

বনহুরকে টেনে-হিঁচড়ে চিয়াংচুর জাহাজে নিয়ে আসা হলো। একটি পৃথক ক্যাবিনে আটকে রাখা হলো তাকে। রাজ-পরিবারের জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো।

আবার চলতে শুরু করলো চিয়াংচুর জাহাজখানা।

যে ক্যাবিনে বনহুরকে রাখা হয়েছিলো, সেই ক্যাবিনের পাশের ক্যাবিনেই চিয়াংচুর দলবল রাজা এবং রাজ-কন্যাকে আটক করে রাখলো।

বনহুর সবকিছু শুনতে পাচ্ছে।

রাজা তার কন্যার নাম ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন-মা অরুণা, তোকে আর রক্ষা করতে পারলাম না। তোর ওপর নির্মম অত্যাচার আমাকে পিতা হয়ে দেখতে হবে,

সুন্দর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর-বাবা, সব হারিয়েছি! মা, দাদু সবাইকে হারালাম, আর কি হবে বেঁচে থেকে! করুণ কান্নার শব্দ ভেসে এলো।

বনহুরের হাত দু'খানা এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। সে ক্যাবিনের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে শুয়ে ছিলো। রাত প্রায় ভোর হয়ে আসছে, ক্যাবিনের জানালা দিয়ে ভোরের আলো প্রবেশ করছে ক্যাবিনে। বনহুরের হাত দু'খানা রশি দিয়ে বাধা না থাকলে সে সবাইকে একবার দেখিয়ে দিতো, কিন্তু তাকে কৌশলে আটক করা হয়েছে। চিয়াংচু অত্যন্ত চতুর বটে!

রাজার করুণ ব্যথাভরা কণ্ঠস্বর-মা অরুণা, কে জানতো এ যাত্রা আমাদের অশুভ হবে! সবাইকে হারাবো এ কথা ভাবতে পারিনি। মা, জানি না আমাদের কি অবস্থা করবে এরা……

এরা নিশ্চয়ই জলদস্যু।

হাঁ, জলদস্যুই হবে। দেখলি না মা কি নির্মমভাবে সবাইকে হত্যা করলো।

বাবা, এরা কি তবে দস্যু বনহুর ও তার দলবল?

জানি না মা, কেমন করে বলবো।

আমি শুনেছি বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে ফেরে। তার হাত থেকে কেউ কোনো দিন রক্ষা পায়না। বাবা, আমরা দস্যু বনহুরের কবলেই পড়েছি। আর আমাদের রক্ষা নেই!

মা, জানি না এরা কারা। তবে শুনেছি দস্যু বনহুর অকারণে কাউকে হত্যা করে না।

দস্যুকে বিশ্বাস নেই বাবা। তুমি কার কাছে শুনেছো দস্যু বনহুর অকারণে কাউকে হত্যা করে না? বাবা, আমার বিশ্বাস এরা দস্যু বনহুরের দল এবং এরা জল্লাদ, নরপশু.......

পশুর চেয়েও অধম! মা, আমাদের ওরা হত্যা না করে এ ভাবে ধরে আনলো কেন? আমাদের মেরে ফেললেই তো সব চুকে যেতো। কিন্তু কি উদ্দেশ্য ওদের......।

জানি না বাবা ভাগ্যে কি আছে আমাদের। কাঁদতে লাগলো রাজকন্যা অরুণা দেবী।

বনহুর দেয়ালে ঠেশ দিয়ে শুয়ে সব শুনছিলো। যখন পিতা কন্যার মুখে নিজের নাম শুনতে পেলো তখন বিস্ময় জাগলো তার মনে। সম্পূর্ণ অজানা দেশ, সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জাহাজের মধ্যে ভয়ংকর বিপদ মুহূর্তে তার নাম ওরা উচ্চারণ করে মনের কথা ব্যক্ত করছে। ওরা তাহলে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অবগত আছে। তার সম্বন্ধে শুধু অবগতই নয়, অনেক কিছু জানে তারা। কোথায় এই রাজপরিবারের দেশ বা রাজ্য কে জানে!

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো।

পাশের ক্যাবিনের দরজা খোলার শব্দ হলো।

পিতা-কন্যা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ কোনো শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না তাদের। দরজা খুলে যারা প্রবেশ করলে তাদের কারও

কণ্ঠস্বর-নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছো নাকি? রাজা, রাজা ও রাজা, ওঠো। তোমার মেয়েকে দলপতির খুব পছন্দ হয়েছে...চলো তোমাদেরও ডেকেছেন তিনি।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, ক্যাবিনের ফাঁক দিয়ে কথাবার্তার আওয়াজ এলেও কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। বললো কেউ-চুপ করে আছো কেন? বাপ-মেয়ে মরে আছো নাকি? ওঠো.....মাল বটে, বহুৎ খুবসুরৎ মেয়ে।

কে যেন বললো–টেনে তুলে নাও।

অপরজন বললো–হাঁ, টেনে নিয়ে চলো। এমনি কি আর যাবে। রাজা ও তার কন্যাকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলো...।

রাজকন্যার কণ্ঠস্বর–আমাকে তোমরা স্পর্শ করো না...খবরদার, আমাকে তোমরা স্পর্শ করো না...

অট্টহাসির শব্দ শোনা গেলো, তারপর রাজার কণ্ঠস্বর-আমাদের হত্যা করো। তোমরা আমাদের সবাইকে হত্যা করেছে, আমাদের জীবিত রেখে কি লাভ... মেরে ফেলো, মেরে ফেলো তোমরা...

চলো নেকামি করো না। মরতে হয় দলপতির সামনে মরবে,..

উঃ! ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...বাবা, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে...বাবা বচাও...বাঁচাও...।

বনহুরের হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ হলো, রাগে অধর দংশন করতে লাগলো। কোনোক্রমে হাত দুখানা মুক্ত করতে পারলে সে দেখে নিতো চিয়াংচু আর তার অনুচরদের। ঠিক এমন সময় সেই বৃদ্ধ ক্যাবিনে প্রবেশ করে।

বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, চাপাকণ্ঠে বললো বুড়ো–বাবা তুমি যেমন করে পারো আমার হাতের রশি কেটে দাও, আমার হাতের রশি কেটে দাও বাবা!

বৃদ্ধ বনহুরের কথা ফেলতে পারলো না, সে তাড়াতাড়ি একটি ধারালো ছুরি এনে বনহুরের হাতের রশি কেটে দিলো।

বনহুর জড়িয়ে ধরলো বৃদ্ধ অনুচরটিকে, আবেগভরা কণ্ঠে বললে-বুড়ো বাবা, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না। আমি তোমাকে কথা দিলাম এই নরপশুর কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করবো......বনহুর বৃদ্ধের হাত থেকে ছোরাখানা দ্রুতহস্তে গ্রহণ করে, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে গেলো বনহুর।

রাজা ও রাজকন্যাকে চিয়াংচুর সামনে হাজির করা হয়েছে। পিতা এবং মেয়ের অবস্থা বড় করুণ, হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা, চুল এলোমেলো, রক্ত জমাট বেঁধে আছে কপালের পাশে। শাড়ীর আচল ভুলুণ্ঠিত, ছিন্নভিন্ন।

চিয়াংচুর ও তার দলবল নরপশুর মত হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। চিয়াংচুর একটি অনুচর এগিয়ে গেলো রাজকন্যার দিকে। শার্দুলের মত থাবা দিয়ে ধরলো রাজকন্যার চুল, তারপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো চিয়াংচুর কাছে।

রাজা কেঁদে উঠলো-বাবা, তোমরা আমাকে মেরে ফেলল, তবুও আমার মেয়েকে অরুণার দেহে হাত দিও না...হাত দিও না...

অরুণা বসে পড়লো চিয়াংচুর পায়ের কাছে।

চিয়াংচু ভয়ংকরভাবে হেসে উঠলো, তারপর হাত বাড়ালো অরুণার দিকে।

অন্যান্য অনুচর রাজার শরীরে কেউ চাবুক, কেউ বা সিগারেটের আগুন, কেউ বা ছোরা দিয়ে খোঁচা মারতে লাগলো। চিয়াংচু ধরে ফেললো রাজকন্যা অরুণাকে, তারপর টেনে নিলো কাছে।

অরুণা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো আমাকে ছেড়ে দাও...আমাকে ছেড়ে দাও...

রাজা ক্ষিপ্তের মত ছুটে গেলো, জড়িয়ে ধরলো মেয়েকে-না না, ওকে তোমরা... আমাকে যত মুখী নির্যাতন করো...আমি...

কথা শেষ করতে দেয় না ওরা, রাজার গলা টিপে ধরে এবং প্রচন্ড এক লাথি মারে তার বুকে।

বৃদ্ধ রাজা দুহাতে বুক চেপে ধরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

মুখ হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে।

রাজকন্যা আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে-আমার বাবাকে তোমরা মেরো না। আমার বাবাকে তোমরা মেরো না…

চিয়াংচু টেনে সরিয়ে নেয় রাজকন্যা অরুণা দেবীকে, তারপর রাজার কণ্ঠ দেশে পা তুলে দিয়ে চাপ দেয় ভীষণ জোরে।

রাজার গলা দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসে। চোখ দুটো বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়, জিতখানাও বের হয়ে আসে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো পেছন দিকের জানালা দিয়ে। চিয়াংচুর পায়ে ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ করে দিলো দ্রুত গতিতে। তারপর ক্ষিপ্তের মত এক একজনকে হত্যা করে চললো।

অতর্কিতভাবে বনহুরের আক্রমণে চিয়াংচুর দলবল ভীষণভাবে হকচকিয়ে গেলো, তারপর দলপতি চিয়াংচুর মৃত্যু তাদের আরও ভড়কে দিলো! তাদের প্রস্তুতি নেওয়ার পূর্বেই বনহুর ওদের কয়েকজনকে হত্যা করলো।

চিয়াংচুর দলবল অল্পক্ষণের মধ্যেই সজাগ হয়ে উঠলো, তারা বনহুরকে পাল্টা আক্রমণ করলো। শুরু হলো তুমুল লড়াই। রাজকন্যা অরুণার চোখে বিস্ময়, কে এই ব্যক্তি যে তার যমদূতকে হত্যা করলো।

রাজার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, তিনি চোখ মেলে একবার দেখলেন, তিনি বুঝতে পারেন, এমন কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যার কাছে দস্যুর কোনো শক্তিই টিকবে না। আবার চোখ বন্ধ করলেন রাজা। তিনি স্বচক্ষে প্রজাদের অবস্থা পরিদর্শন করে দেশে ফিরছিলেন। কন্যা অরুণা দেবী, স্ত্রী মায়া দেবী, দু'ছেলে সঙ্গে ছিলেন, আরও সঙ্গে ছিলেন তার কয়েকজন রাজকর্মচারী। দস্যুগণ সবাইকে হত্যা করেছে শুধু জীবনে বাঁচিয়ে রেখেছে রাজা ও তার কন্যাটিকে। অরুণার অপরূপ সৌন্দর্য চিয়াংচুর মনে অদম্য লালসা জাগিয়েছে, উম্মাদ হয়ে উঠেছে সে। তাই রাজকন্যাকে বশ করার জন্য রাজাকে হত্যা না করে রাজা ও রাজকন্যাকে নিয়ে এসেছে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সঙ্গে।

রাজকন্যা অরুণা দেবী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। চিয়াংচুর হাতে সে মৃত্যুবরণ করবে, তবু সতীত্ব বিসর্জন দেবে না। তার ইজ্জত রক্ষার্থে যদি পিতার মৃত্যু হয়

তাও মেনে নেবে সে।

যে মুহূর্তে অরুণা চিয়াংচুর কবল থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো সেইক্ষণেই কে একজন সূতীক্ষ্ণধার ছুরিকা হস্তে দেবদূতের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং ছুরিবিদ্ধ করেছিলো শয়তান চিয়াংচুর বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরগণ ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলো মুহূর্তের জন্য। সেই সুযোগে বনহুর চিয়াংচুর দলবলের প্রায় অর্ধেককে হত্যা করে ফেলে। আক্রমণ চালিয়েও চিয়াংচুর দল সুবিধা করতে পারলো না।

বনহুরের হাতে সবাই ঘায়েল হতে লাগলো।

রাজকন্যা অরুণা দেবীর দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ভীত-আতঙ্কিতভাবে সে তাকিয়ে আছে বনহুর ও চিয়াংচুর যুদ্ধরত অনুচরগণের দিকে। কে এই ব্যক্তি যে এই জলদস্যু দলের জাহাজেই অবস্থান করছিলো এবং দস্যুদের এভাবে নাজেহাল করে চলেছে?

তুমুল লড়াই চলেছে।

বনহুরের যুদ্ধ-কৌশলের কাছে ওরা কেউ পেরে উঠলো না। কেউ কেউ বনহুরকে রিভলভার নিয়ে আক্রমণ করলো। গুলি চালাতেই বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে আত্মরক্ষা করে। গুলি গিয়ে বিদ্ধ হয় ক্যাবিনের গায়ে এবং চিয়াংচুর অন্য অনুচরের দেহে। আর্তনাদ আর তীব্র চিৎকারে সমস্ত জাহাজখানা ভরে উঠলো। শেষ পর্যন্ত চিয়াংচুর অনুচরগণ তাদের ভয়ংকর মারণাস্ত্রগুলো নিয়ে বনহুরকে আক্রমণ করলো।

বনহুর নিজে সব অস্ত্র চালনা করতে জানতো, কাজেই তাকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিপুণতার সঙ্গে নিজকে রক্ষা করতে লাগলো এবং সেই মারাত্মক অস্ত্র দিয়েই পালটা আক্রমণে জলদস্যগণকে খতম করে চললো।

সে এক ভীষণ আর ভয়ংকর দৃশ্য!

যমদূতের মত এক একজন জলদস্য, তাদের কাহিল করা কম কথা নয়। বনহুর একা। ওরা বেশ কয়েকজন। এক একজন অসুরের মত শক্তিশালী।

বনহুর কৌশলে তাদের এক একজনকে হত্যা করে চললো। যখন মাত্র তিনজন অনুচর টিকে আছে তখন ওরা বনহুরের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। বনহুর তাদের রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো।

এবার বনহুর স্থির হলো, রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে সে। চিয়াংচুকে প্রথমেই হত্যা না করলে এত সহজে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব হতো না।

তিনজন বন্দীকে একই রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো বনহুর। তারপর রাজা এবং রাজকন্যা অরুণা দেবীর দিকে তাকালো।

অরুণা ভীত এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। বনহুর তাকাতেই উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো। এগিয়ে এলো বনহুর তার দিকে, গম্ভীর শান্ত গলায় বললো–অরুণা দেবী, এবার আপনি নিশ্চিন্ত। জলদস্যু চিয়াংচু ও তার দলবলকে আমি নির্মূল করেছি। দেখুন আপনার পিতার অবস্থা এখন কেমন?

অরুণা একজন অপরিচিত ব্যক্তির মুখে তার নিজের নাম শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হলো। যাকে সে কোনোদিন দেখেনি বা চেনে না, সে কি করে তার নাম জানতে পারে! কিন্তু বেশীক্ষণ ভাববার সময় তার নেই, তাড়াতাড়ি পিতার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ডাকলো অরুণা-বাবা, চোখ মেলো...... দেখো বাবা, চোখ মেলে দেখো....

অরুণা মা অরুণা......ধীরে ধীরে অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন রাজা তার কন্যার নামা, চোখ মেলে তাকালেন।

বনহুর অরুণার বিপরীত পাশে বসে রাজার চিবুকটা উঁচু করে ধরে বললো– আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

হাঁ বাবা, আমার ঘাড়ে ভীষণ আঘাত করেছিলো, তাই বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। আঃ বাবা কে তুমি? কে তুমি বাবা..

আমার পরিচয় পরে জেনে নেবেন! চলুন রাজা, এখান থেকে অন্য ক্যাবিনে যাই। আসুন অরুণা দেবী।

অরুণার দু'চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছে। এমন সুন্দর করে কাউকে কথা বলতে শোনেনি সে। বলিষ্ঠ সুন্দর দীপ্তিময় পুরুষ। পৌরষদীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

বনহুর রাজাকে তুলে পাশের ক্যাবিনে গিয়ে গেলো। ঐ ক্যাবিনটি চিয়াংচুর বিশ্রামকক্ষ বলে মনে হলো। কারণ একটি শয্যা পাতা ছিলো ক্যাবিনের মধ্যে। রাজাকে সেই শয্যায় শুইতে দিয়ে অরুণাকে বললো বনহু-আপনি আপনার পিতার পাশে থেকে সেবাযত্ন করে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করুন। আমি ঐ শয়তান তিনজনকে শায়েস্তা করে আসি। বেরিয়ে যায় বনহুর।

অরুণা দেবী পিতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো সে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো অরুণা দেবীর চোখ থেকে। স্নেহময়ী জননী, দুটি বড় ভাই এবং আরও লোকজনকে হারিয়েছে অরুণা, চিৎকার করে তার কাঁদতে ইচ্ছা করছে কিন্তু গলা দিয়ে কান্না বের হচ্ছে না। অল্প শোকে মানুষ হয় কাতর আর বেশি শোকে হয় পাথর। অরুণার অবস্থা তাই, তার ভেতরটা যেন পাথর হয়ে গেছে।

দুদিন পূর্বেও অরুণার মনে ছিলো কত আনন্দ, কত শান্তি আর আজ, সব হারিয়ে সে দিশেহারা, একমাত্র পিতাই তার সম্বল। জীবনে রক্ষা পেলো তারা পিতা আর কন্যা। ভীষণ ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে এ জীবন বাঁচালো কিন্তু এর পর কি হবে কে জানে। আর কোনো নতুন বিপদ এসে উপস্থিত হবে কিনা তাই কে জানে! এই মহৎ ব্যক্তিটাই বা কে? জলদস্যুদেরই একজন হবে কিন্তু সে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে এবং তার পিতাকে এভাবে রক্ষা করলো নিজের জীবন বিপন্ন করে? অরুণা দেবী তো নিজের চোখে দেখলো, এতগুলো ভয়ংকর লোক নানা ধরনের মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কি সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করেছিলো। যে কোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটতে পারতো, অসীম শক্তি আর বুদ্ধিমত্তাই তাকে জয়যুক্ত করলো-সব তো সে নিজের চোখে দেখেছে।

এখানে যখন অরুণা বনহুরকে নিয়ে ভাবছিলো তখন বনহুর সেই ক্যাবিনে ফিরে দিয়েছে। পিছমোড়া করে বাধা দলদস্যু তিনজনকে লক্ষ্য করে বললো– তোমরা জীবনে বাঁচতে চাও না দলপতির মত মৃত্যু চাও?

একজন বললো কি হবে আর জীবনে বেঁচে! তুমি আমাদের হত্যা করো। এ বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ অনেক ভালো।

বনহুর অবাক না হয়ে পারলো না, কারণ লোকটার কথার মধ্যে ছিলো একটা বলিষ্ঠতার ছাপ। বিশেষ করে বনহুরের অনুচরগণ ছাড়া কেউ কোনোদিন এমন করে কথা বলতে পারে না।

অপরজন বলে উঠলো–না না, আমাদের মেরো না। সবাইকে তো খতম করলে, এবার আমাদের যা বলবে তাই শুনবো, প্রাণে মেরো না। প্রাণে মেরো না,.....

তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চুপ, তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। লোকটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সে এদের দুজনের চেয়ে কিছু দুর্বল। বনহুর ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো, তারপর সে আরও একটু কাছে সরে এসে বললো–এ জাহাজ এখন আমার হাতের মুঠোয়। তোমাদের দলপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও শুনতে হবে। যদি কথা দাও আমার কথামত চলবে, তাহলে আমি তোমাদের হত্যা করবো না, মুক্তি দেবো।

প্রথমজন বললো–সবাই মৃত্যুবরণ করেছে, আমরাও করবো, তবুও তোমার দাসত্ব গ্রহণ করবো না।

বনহুর ওর কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। লোকটা সহাসী ও স্পষ্টবাদী। বনহুর কোনো উত্তর না দিয়ে তাকালো অপরজনের মুখের দিকে।

অপরজন বললো–তুমি যা বলবে তাই শুনবো। আমাদের বন্ধু মুক্ত করে দাও।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

কিন্তু তোমার সঙ্গীর কথা শুনেছো?

ওকে হত্যা করো তবুও আমাকে জীবনে মেরো না।

আচ্ছা তাই হোক। তবে এক্ষুণি তোমাদের কাউকেই আমি মুক্ত করবো না, যতক্ষণ তোমাদের সেই বৃদ্ধ সঙ্গীটিকে খুঁজে না পাবো। কারণ তাকে আমি হত্যা করিনি। যারা নিহত হয়েছে তার সবাই আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। বৃদ্ধাকে আমি হত্যা করিনি, তাহলে সে গেলো কোথায়? তোমাদের মুক্ত করার পূর্বে তাকে খুঁজে বের করবো। বনহুর সেই ক্যাবিনে থেকে বেরিয়ে গেলো।

যে ক্যাবিনে তাকে প্রথমে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো সেই ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়ালো সে। ভেতরে কেউ নেই। কিছু কাপড়-চোপড় পড়ে আছে। বনহুর পাশের কয়েকটা ক্যাবিনেও খোঁজ করলো কিন্তু কোনো ক্যাবিনে কাউকে দেখতে পেলো না, ডেকের আশেপাশেও সে ভালভাবে দেখলো।

ফিরে চললো সে এবার এ ক্যাবিনে, যে ক্যাবিনে এবং ডেকের উপর বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো মৃতদেহ। বনহুর এগুতেই একটা ক্যাবিনের ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ কানে এলো তার। বনহুর ভেতরে প্রবেশ করলো, দেখলো একটা রশি দিয়ে সেই বৃদ্ধ অনুচরটির হাত-পা বাঁধা। দু'চোখের কোল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চাকু দিয়ে বৃদ্ধের দুচোখ তুলে নেয়া হয়েছে।

বনহুর নিজের পকেট থেকে ছোট্ট চাকুখানা বের করে বৃদ্ধের হাত-পা বাঁধন কেটে দিয়ে ওকে তুলে বসিয়ে দিয়ে বললো বুড়ো বাবা, তোমার এ অবস্থা কে করেছে। এমন সর্বনাশ কে করলো তোমার?

বৃদ্ধ বনহুরের কণ্ঠস্বরে চিনতে পারলে, সে বললো–তুমি বেঁচে আছো? আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি কি করে বেঁচে রইলে?

আল্লাহ পাক আমাকে রক্ষা করেছেন বুড়ো বাবা। কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন? আর কখন তোমার এ অবস্থা হলো? কে করলো?

আমাদের দলের লোক আমার এ অবস্থা করেছে। আমি তোমাকে সহযোগিতা করেছি, ওরা তা বুঝতে পেরেছিলো তাই আমার এ অবস্থা...উঃ! কি যন্ত্রণা, আঃ কি কষ্ট...ওরা আমাকে মেরে ফেললো না কেন বাবা......

বনহুর তুলে দাঁড় করিয়ে ধরে ধরে নিয়ে চললো বুড়ো বাবাকে। ঐ ক্যাবিনে নিয়ে গেলো, তারপর সেই বন্দী তিনজনের সামনে নিয়ে বললো–এর এই অবস্থা কারা করেছে। বলো তোমরা না অন্য কেউ?

তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠলো–ঐ করেছে। তার পাশের সঙ্গীকে দেখিয়ে দিলো।

প্রথম ব্যক্তি বললো–যে বলছে সেও সঙ্গে ছিলো। ওরা দুজনই করেছে, আমি দেখেছি.......।

বনহুরের দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হলো, মুঠি দিয়ে আঁকড়ে ধরলো একজনের চুলের গোছা। ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো বনহুর–কি কারণে এর চোখ তুলে নিয়েছো? বলো, জবাব দাও? আমি এখন তোমাকে হত্যা করে চোখ দুটো তুলে নেবো, তারপর......

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো লোকটা।

অপরজন বললো–আমাদের কোনো দোষ নেই। মাংগুর আদেশে আমরা এ কাজ করেছি......আমাদের কোনো দোষ নেই...

বনহুর পুনরায় ওর চুলের মুঠিতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো দোষ তোমরা যা করেছে তার ক্ষমা নেই। মরতে তোমাদের হবেই এবং সে মৃত্যু গুলীবিদ্ধ করে নয়। এই বৃদ্ধের ওপর তোমরা যেভাবে নির্যাতন চালিয়েছে ঠিক সেইভাবে তোমাদের ওপর আমি অস্ত্র চালাবো। কে তোমাদের আদেশ দিয়েছে তা জানতে চাই না......

প্রথম ব্যক্তি বললো–মাংগু যা হুকুম করেছে ওরা তাই করেছে। বুড়ো তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছে সেই কথা সে জানতে পেরেছিলো......কিন্তু মাংশু বাঁচতে পারেনি। সে বুড়োকে অন্ধ করে দেবার আদেশ দিয়েই ছুটে এসেছিলো এবং মারণাস্ত্র চালিয়ে যে মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করবে ঐ মুহূর্তে তোমার রিভলভারের গুলি ওকে শেষ করে দিয়েছে। ঐ যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে......

বনহুর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো মাংশুর শয়তান প্রাণহীন দেহটার দিকে। তারপর বললো–তোমরা আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। বুড়ো বাবার এ অবস্থা করার জন্য তোমাদের আমি উপযুক্ত শাস্তি দেবো। বনহুর এবার বৃদ্ধের হাত ধরে একপাশে বসিয়ে দিয়ে ফিরে এলো ওদের তিনজনের পাশে।

বললো বনহুর–তোমাদের আমি মুক্ত করে দিচ্ছি ...

সত্যি! একজন খুশি হয়ে বললো।

বনহুরের দক্ষিণ হাতে গুলীভরা রিভলভার, সে রিভলভার উদ্যত করে রেখে বাম হাতে কেটে দিলো ওদের বাঁধন, তারপর বললো–এই ছড়িয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো এক একটি করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো।

বনহুরের কঠিন কণ্ঠের আদেশ পালন না করে পারলো না ওরা। মৃতদেহগুলো এক একটি করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো সমুদ্রগর্ভে। চিয়াংচুর দেহটা যখন তুলে নিলো ওরা হাতের ওপর তখন ভীত আতঙ্কিত দেখাচ্ছিলো ওদের মুখোভাব।

হাসলো বনহুর। সে দেখছিলো নিজেদের সঙ্গীগণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ওদের কেমন লাগছিলো। দলপতির প্রাণহীন দেহটা যখন সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য ওর তুলে নিলো হাতের ওপর তখন ফ্যাকাশে লাগছিলো ওদের মুখোভাব। নরপশুটা প্রাণহীন তবুও ওরা ভীষণ ভয় পাচ্ছিলো, একটু এদিক ওদিক হলেই চরম শাস্তি পেতে হয়েছে। অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে, সে এক ভীষণ আর ভয়ংকর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে অনেককে। আজ যখন অনুচর তিনজন চিয়াংচুর মৃতদেহ সদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করার জন্য তুলে নিলো তখন তাদের হৃদকম্প হচ্ছিলো।

বনহুর বললো–যাও তোমাদের দলপতিকে এবার হাঙ্গর আর কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করো। তার কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত হোক....

ওরা চিয়াংচুর লাশ নিয়ে ডেকের দিকে এগুলো।

ফিরে দাঁড়ালো বনহুর, দেখলো অরুণা দেবী দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে।

বনহুর বললো–আপনি!

বললো অরুণা-বাবা এখন অনেকটা সুস্থ।

চলুন দেখি। অরুণা আর বনহুর যে ক্যাবিনে রাজা ছিলেন সেই ক্যাবিনের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু দু'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললো বনহুর–অরুণা দেবী, আমি এখনও নিশ্চিন্ত নই কারণ যারা এ মুহূর্তে সঙ্গীদের মৃতদেহ আমার নির্দেশে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে গেলো, তাদের হাত-পা মুক্ত রয়েছে। শয়তানদের বিশ্বাস নেই। ঐ যে বৃদ্ধকে দেখছেন তাকে অন্ধ করে ফেলেছে এরা।

এবার অরুণার দৃষ্টি চলে গেলো ঐ বৃদ্ধের দিকে। বিস্ময়ভরা গলায় বলরো-কি নির্মম! ওর এ অবস্থা কেন?

ঐ বৃদ্ধ প্রথম থেকে আমাকে সহায়তা করে এসেছে, তাই ওর প্রতি তার সঙ্গীদের এই নির্মম আচরণ। ও এখন আমাদের ওপর নির্ভরশীল। চলুন ওকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই.....

অরুণা বেদনাভরা চোখে তাকালো বৃদ্ধের দিকে, তারপর বৃদ্ধের হাত ধরে বললো–চলো...

বনহুর ধরলো অপর পাশে।

বনহুর আর অরুণা দেবী মিলে নিয়ে এলো বৃদ্ধকে সেই ক্যাবিনে যে ক্যাবিনে রাজা শুয়ে ছিলেন।

পদশব্দে মাথা উঁচু করে বললেন রাজা মা অরুণা, এসেছি মা? কোথায় সেই মহান ব্যক্তি যার দয়ায় তোকে ফিরে পেয়েছি মা? সব হারিয়েও তোকে পেয়েছি। তাকে পেয়েছিস মা?

বনহুর আর অরুণা বৃদ্ধকে এক পাশে বসিয়ে দিয়ে সরে এলো রাজার পাশে।

অরুণা পাশে বসে পিতার বুকের ওপর হাত রেখে বললো– এই তো বাবা তিনি এসেছেন!

চোখ মেললেন রাজা, ভাল করে লক্ষ করে দেখতে লাগলেন এমন করে দেখার সুযোগ তার হয়নি। বনহুরকে তিনি দেখেছিলেন কিন্তু এমন এক অবস্থায় দেখেছিলেন যখন তার জীবন বিপন্ন, মৃত্যপথের যাত্রী হিসেবে তিনি যমদূতের সঙ্গে মোকাবেলা করছিলেন। এখন তিনি জীবনে বেচে গেছেন, এ মুহূর্তে মৃত্যু ভয় তার নেই। রাজা তাকালেন, এবং দেখলেন যাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি সত্যি দেবতুল্য, এমন ব্যক্তি তার ও তার কন্যার জীবন রক্ষার্থী হবে এটা অবিশ্বাস্য নয়। তিনি বললেন-বাবা, আপনি যেই হোন আমার ও আমার মেয়ের জীবন রক্ষা করেছেন। শুধু জীবন রক্ষাই করেননি, আমার অরুণার ইজ্জত রক্ষা করেছেন আপনি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন আমি আপনাকে আশীর্বাদ করছি।

বনহুর বললো–আপনার ও আপনার কন্যার রক্ষাকর্তা এক মাত্র আল্লাহ, আমি উপলক্ষ মাত্র। এখন আমরা মুক্ত এ কথা সত্য, কিন্তু এখনও আমরা বিপদমুক্ত নই। কারণ আমরা অজানা অচেনা এক সমুদ্রের বুকে জাহাজে রয়েছি। এ জাহাজে এখন কোনো চালক নেই, যারা জাহাজখানাকে চালনা করছিলো তারা

সবাই জলদস্য এবং তারা সবাই আক্রমণ। চালিয়েছিলো আপনাদের জাহাজখানাকে……

বাবা আমাদের জাহাজ…….

সে জাহাজখানা আর নেই, সেটা লুটতরাজ করার পর ধ্বংস করে তলিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনারা দু'জনকে এই জাহাজে ধরে আসার পর যখন ওরা আপনাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছিলো তখন আমি কৌশলে সবাইকে হত্যা করি। শুধু তিনজনকে আমি এ জাহাজে জীবিত রেখেছি….

জীবিত আছে! ঐ জলদস্যুদের অনুচরগণের মধ্যে তিনজন এখনও জীবিত?

হাঁ রাজা।

ওদের কেন জীবিত রাখলেন? ওরা আমার সমস্ত শরীর আগুনে ঝলসে দিয়েছে। দেহে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, এই দেখুন, এই দেখুন…

রাজা তার দক্ষিণ হাতখানা তুলে ধরে ক্ষতগুলো দেখালেন।

অরুণার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। পিতার করুণ অবস্থা সে তাকিয়ে দেখছে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর বললো–ওরা আপনার আর আপনার মেয়ের আর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ওদের প্রয়োজন আছে তাই জীবিত রেখেছি।

অরুণা বিস্ময় নিয়ে বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, লোকটা অদ্ভুত বটে। কে এই ব্যক্তি, কি এর পরিচয়, এই জাহাজে জলদস্যুদের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? সব তাকে ভাবিয়ে তুললো।

বনহুর রাজার শরীরের ক্ষতস্থানগুলো ভালভাবে লক্ষ করে পুনরায় বললো– আপনার ক্ষতস্থানগুলোতে ওষুধ লাগানো দরকার, চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন কিন্তু ডাক্তার বা ওষুধ এ জাহাজে নেই….

বনহুর আর রাজার কথাবার্তাগুলো শুনছিলো চিয়াংচুর বৃদ্ধ অনুচরটি। যদিও সে চোখে দেখতে পাচ্ছিলো না এবং তার চোখে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিলো তবুও

কাঁদতে-কাঁদতে বললো–বাবা, তুমি সব অসুধ পাবে জাহাজের নয় নম্বর ক্যাবিনে। সেখানে সব ওষুধ আছে আর ওষুধের শিশির গায়ে ওষুধের নাম লেখা আছে। তুমি যাও সেই ওষুধ নিয়ে এসো।

বুড়ো বাবা, সত্যি এ জাহাজে সব ওষুধ আছে?

হা আছে। আমাদের দলপতি রকম ওষুধ জাহাজে রাখতো, যখন যা প্রয়োজন তা ব্যবহার করতো। দলপতির কিছুটা চিকিৎসা জ্ঞানও ছিলো।

বনহুর খুশি হয়ে বললো–যাক দেখি কি ওষুধ পাওয়া যায়।

অরুণা বললো–কিছু কিছু ওষুধের নাম আমার জানা আছে। চলুন যদি বাবার জন্য এবং ওর জন্য কিছু ওষুধ পাই।

চলুন অরুণা দেবী।

বনহুর আর অরুণা নয় নম্বর ক্যাবিনের দিকে গেলো।

রাজা মাথা উঁচু করে তাকালেন বুড়ো বাবার দিকে। ওর ভয়ংকর দস্যপনা চেহারার দিকে তাকিয়ে কিছুটা অনুধাবন করলেন, লোকটা সাধারণ মানুষ নয়। সে একজন জলদস্যু তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে বৃদ্ধ। বয়স হওয়ায় চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। ওর চোখ দুটো নির্মমভাবে তুলে নেয়া হয়েছে। এখনো রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত লেগে আছে। লোকটা ব্যথা আবার যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

রাজার কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে ওর, রাজা বললেন-ভাই, তোমার এ অবস্থা কেন? কে তোমাকে এমন করেছে? তুমি কি এদের লোক নও?

বৃদ্ধ বললো–হাঁ, আমি জলদস্যু এবং চিয়াংচুর দলের লোক। কিন্তু আমি বৃদ্ধ, তাদের মন যুগিয়ে চলতে পারতাম না, তাই আমাকে দিয়ে ওরা চাকরের কাজ করাতো। আমি ঐ মহৎ ব্যক্তি যার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন তার কিছু উপকার করেছি। তাকে বন্দী করে রেখে আপনাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে যাচ্ছিলো তারা। আমি তাকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে দেই, সেজন্যই আমাকে দলপতির সহকারীরা এ অবস্থা করেছে। আমার চোখ তুলে নিয়ে আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

রাজা সব শুনে মাথাটা বালিশে রাখলেন, তারপর করুণ কণ্ঠে বললেন-ভাই, তোমাদের জন্যই আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। নইলে তোমাদের দলের লোক আমাকে এবং আমার মেয়েকে মেরে ফেলতো। তোমার জন্যই তাহলে উনি আমাদের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

বৃদ্ধ কোঁকাতে লাগলো। কোনো উত্তর দিলো না।

এমন সময় বনহুর আর অরুণা দেবী ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো। তারা বৃদ্ধের কথামত নয় নম্বর ক্যাবিনে প্রবেশ করে সেখানে ডাক্তারী সরঞ্জাম এবং ওষুধপত্র পায়। যা যা প্রয়োজন নিয়ে এলো বনহুর আর অরুণা।

বনহুর অরুণার সাহায্যে ওষুধগুলো ঠিকভাবে রাজার ক্ষতস্থানগুলোতে এবং বৃদ্ধের চোখে লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলো। অত্যন্ত মূল্যবান ও জরুরি ওষুধ ছিলো চিয়াংচুর নয় নম্বর ক্যাবিনে, কাজেই বনহুর আর অরুণা রাজা এক বৃদ্ধের যথাযথ চিকিৎসা করতে পারলো।

যন্ত্রণা অনেকটা কমে এলো ওদের।

একই ক্যাবিনে রাজা ও বৃদ্ধকে রাখা হলো।

বৃদ্ধের কথামত তারা ষ্টোর রুমে প্রবেশ করে প্রচুর খাবার পেলো। বিস্কিট, পাউরুটি, মাখন, মোরা এবং বিভিন্ন রকম ফল। চিয়াংচু সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করে ফিরতো, তাই তার জাহাজে খাদ্যের অভাব ছিলো না, রক্ষণাগারে প্রচুর খাদ্য জমা রাখতো।

বনহুর খুশি হলো, কারণ কে জানে কতদিন এভাবে গভীর জলরাশির বুকে তাদের অবস্থান করতে হবে!!

নিশ্চুপ ভাবছিলো বনহুর।

এ ক্যাবিনে কেউ তার পাশে নেই। চিয়াংচুর জীবিত তিনজন অনুচরকে বনহুর সাবধান করে দিয়েছে, তারা যেন কোনোরূপ চালাকি না করে। কোন বুদ্ধিকৌশল আঁটতে গেলে বিপদে পড়বে। বনহুর আরও বলেছে কোনো রকম চালাকি বা ষড়যন্ত্র করলে তাদেরকে সে

আর ক্ষমা করবে না। বরং তারা তাকে সহায়তা করলে জীবনে রক্ষা পাবে।

জাহাজখানা এখন উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে চলেছে। যেহেতু কেউ এখন চালাচ্ছে না, কোথায় ভেসে চলেছে তা তারা কেউ জানে না। বনহুর নিজে জাহাজখানা চালনায় দক্ষ কিন্তু সাহায্যকারী হিসেবে একজনের প্রয়োজন রয়েছে। বনহুর চিয়াংচুর দলের তিনজন বন্দীকে মুক্ত করে দিয়ে এ কথা বলেছে। তারা যদি তাকে সহায়তা করে তাহলে তাদের কোনো ভয় নেই। বনহুরের কথায় রাজি হয়েছে তারা, তাই তাদেরকে জাহাজের ইঞ্জিন ক্যাবিনে গিয়ে সব দেখে পরীক্ষা করে নিতে বলেছে বনহুর।

বনহুর ভাবলো, এই অজানা সমুদ্রবক্ষে জাহাজখানাকে চালনা করতে হলে চাই দক্ষ লোক এবং যার এসব পথ চেনা আছে। এই সমুদ্রবক্ষে তার নতুন আগমন, সে জানে না কোথায় ডুবু পর্বত আছে কিনা। হঠাৎ কোনো ডুবুপর্বতে জাহাজ ধাক্কা খেলে জাহাজের তলদেশ ফেঁসে যাবে এবং সেই মুহূর্তে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

বনহুর গভীর মনোযোগ সহকারে ভাবছিলো।

চিয়াংচুর দলবল ধ্বংস হয়ে গেছে, যে তিনজন রয়েছে তারা তারই মুখাপেক্ষী। এ ছাড়া রাজা ও রাজকন্যা অরুণা রয়েছে আর আছে বুড়ো বাবা! বুড়ো বাবার অমঙ্গল কখনও চিন্তা করতে পারে না বনহুর। তার জন্যই আজ বনহুর নিজে এবং রাজা ও রাজকন্যার জীবন রক্ষা পেয়েছেন। তাদের বাঁচাতে গিয়েই সে তার চোখ হারিয়েছে, তাদের বাঁচাতেই হবে, আল্লাহ যেন তাকে সে শক্তি দেন। হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে। ক্যাবিনে প্রবেশ করে রাজকন্যা অরুণা দেবী।

বনহুর ক্যাবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে ক্যাবিনের জানালাপথে বাইরে তাকিয়েছিলো এবং গভীরভাবে চিন্তা করছিলো।

অরুণার পদশব্দে চোখ ফেরালো বনহুর, অরুণা দেবীকে দেখে সোজা হয়ে বসে বললো–আপনি চলে এলেন যে?

বাবা ও বুড়োবাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। একা একা ভালো লাগছে না তাই চলে এলাম আপনার খোঁজে। ভয় হচ্ছিলো ওরা তিনজন তো মুক্ত রয়েছে, যদি কিছু একটা মতলব এটে বসে।

না, তেমন সাহস পাবে না ওরা। বসুন।

বনহুর হাত দিয়ে পাশের একটা উঁচু আসন দেখিয়ে দিলো।

অরুণা বসলো, কিন্তু উঁচু আসনটার উপরে নয়। বনহুরের পাশে বসে বললো– সত্যি আপনার তুলনা হয় না। বাবা, আপনার কথা বলতে বলতে বিগলিত হয়ে পড়েছিলেন আপনি যদি আমাদের উদ্ধার না করতেন তাহলে বাবা আর আমার জীবন বিনষ্ট হয়ে যেতো, মৃত্যুর চেয়ে সে অবস্থা মর্মান্তিক। ওরা বাবাকে হত্যা করে আমার ওপর অমানুষিক আচরণ চালাতো…বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে অরুণার কণ্ঠস্বর।

বনহুর নিশ্চুপ রইলো। সান্ত্বনা দেবার মত কোনো কথা যেন এ মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছে না।

অরুণা আঁচলে চোখ মুছে বললো–ঐ ব্যক্তি দস্যু বনহুর। আপনি কি দস্যু বনহুরের নাম শুনেছেন?

বনহুর চোখ তুলে তাকালো লাবণ্যময়ী অরুণা দেবীর মুখের দিকে।

অরুণা দেবী বলে চলেছে-বুড়ো বাবার মুখে শুনেছি আপনি এদের দলের লোক নন। আপনাকে এরা কোনো এক স্থানে কুড়িয়ে পেয়েছে। সে কারণেই আপনি এদের আসল পরিচয় জানেন না। আমি শুনেছি দস্যু বনহুর বিশ্ববিখ্যাত দস্যু যার অসাধ্য কিছু নেই। যেমন ভয়ংকর তেমনি হৃদয়হীন……যাকে আপনি হত্যা করেছেন সেই লোকটাই স্বয়ং! দস্যু বনহুর। আপনার উপকার আমরা কখনও ভুলতে পারবো না, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনি কিভাবে জানলেন, আমি যাকে হত্যা করেছি সেই দস্যু বনহুর? তার প্রমাণ কোথায়?

অরুণা বললো–প্রমাণ তার চেহারা, তার কার্যকলাপ। এমন হৃদয়হীন পৃথিবীতে দ্বিতীয়জন বুঝি নেই। আমার মা, আমার বড় ভাই এবং পরম আত্মীয় যারা ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তাদের সবাইকে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এমন হত্যালীলা এক দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ করতে পারে না……বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে ওঠে অরুণা দেবী।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো–অরুণা দেবী, আপনি যা ভাবছেন তা সত্য নাও হতে পারে। বনহুর সম্বন্ধে আপনি যা শুনেছেন তা হয়তো ঠিক নয়।

আপনি জানেন না, আমার কাকা রাজা মহেন্দ্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো বনহুর।

রাজা মহেন্দ্রনাথ! কথাটা আপন মনে উচ্চারণ করলো বনহুর, তার তখন বহুদূরে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করছে। মনে পড়লো তার এক নর পিশাচ রাজা যার অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছিলো সেই মন্থনা দ্বীপ। বিস্ময় নিয়ে তাকালো বনহুর অরুণা দেবীর দিকে।

অরুণা দেবী বনহুরের দৃষ্টি মধ্যে একটা প্রশ্ন ও ঔৎসুক্য লক্ষ্য করলো, বললো–আমার কাকা মহেন্দ্রনাথকে দস্যু বনহুর যেভাবে হত্যা করেছিলো তা শুনলে আপনি ভীষণ ব্যথা পাবেন।

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সেদিনের স্মৃতিগুলো তার মানসপটে ভেসে উঠছে। এক অনুচররের মুখে শুনেছিলো বনহুর রাজা মহেন্দ্রনাথের কথা। মন্থনাদ্বীপে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। প্রজাগণ খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়। অথচ রাজা তার খাজনার জন্য প্রজাদের উপর চালাচ্ছিলো অকথ্য অত্যাচার, নিষ্পেষণ। প্রজাদের ধরে এনে তাদের হাত-পা বেঁধে চাবুক মারা হচ্ছিলো। পিঠের চামড়া কেটে রক্ত ঝরছিলো। কারো কারো যুবতী কন্যাকে ধরে এনে তার ওপর চালানো হচ্ছিলো অত্যাচার, যা অবর্ণনীয়। প্রজাগণ সেই মহাবিপদ মুহূর্তে রাজার সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া দূরের কথা, তাদের ওপর খাজনা না দেওয়ার জন্য অত্যাচার চালানো হচ্ছিলো। বনহুর এ সংবাদ পেয়ে নিশ্চুপ থাকতে পারেনি, তার জাহাজ উলকা নিয়ে রওনা দিয়েছিলো মন্থনা দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ছিলো রহমান এবং কয়েকজন অনুচর। মন্থনা দ্বীপের অদূরে এক গোপন স্থানে জাহাজ নোঙ্গর করে বিদেশী বণিকের ছদ্মবেশে মন্থনায় প্রবেশ করেছিলো বনহুর। ঘটনা যা সে শুনেছিলো তার সত্যতা প্রমাণের জন্যই বনহুর বণিকের ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। সেদিন বনহুর রাজা মহেন্দ্রনাথের বাগানবাড়ীতে যে নাটকীয় দৃশ্য দেখেছিলো তা ছিলো রাজা মহেন্দ্রনাথের প্রজাদের প্রতি নির্মম আচরণের চরম প্রমাণ।

সেইদিন গভীর রাতে রাজা মহেন্দ্রনাথকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো বনহুর। তার দেহ থেকে বিছিন্ন মস্তকটা সে ঝুলিয়ে রেখেছিলো রাজপথের এক

সৌধচূড়ায়। বিচ্ছিন্ন মস্তকটার সঙ্গে ছিলো একটা লাল চিঠি, বনহুর লিখেছিলো

চরম অমানুষিকতার পরিণাম।

—দস্যু বনহুর।

সব স্পষ্ট মনে পড়ছে বনহুরের। হঠাৎ বনহুর অট্টহাসি হেসে ওঠে। সে হাসি যেন থামতে চায় না। অরুণার দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে, এমন করে সে তত কাউকে হাসতে দেখেনি কোনো দিন। অদ্ভুত সে হাসি, তারপর হঠাৎ হাসি থেমে যায়, বলে বনহুর–রাজা মহেন্দ্রনাথ আপনার কাকা মানে আপনার পিতার আপন ভাই?

হা হা, তিনি আমার বাবার ছোট ভাই ছিলেন।

কিন্তু আপনার বাবা তো অতি মহান, মহৎ ব্যক্তি বলে মনে হয়। রাজা মহেন্দ্র ছিলো....

হাঁ, বাবা সে কারণেই কাকাকে ভাল নজরে দেখতেন না।

তাহলে দস্যু বনহুর কি করে তাকে ভাল নজরে দেখবে বলুন?

দস্যু বনহুর হৃদয়হীন! তার নাম শুনলে মানুষের হৃদকম্প শুরু হয়।

না, অরুণা দেবী, মানুষের হৃদকম্প হয় না, হয় যারা মানুষের শত্রু তাদের। যারা অন্যায় আচরণে মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তাদের হৃদকম্প শুরু হয় ঐ নাম শুনে।

আপনি এত জানলেন কি করে?

অরুণা দেবী, আপনি যদি জানতে পেরে থাকেন তাহলে আমি জানবো এটা তো অস্বাভাবিক নয়। এবার বনহুর ক্যাবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলো, অরুণা দেবী আপনার বাবা বা আপনাদের সম্বন্ধে এখনও আমি কিছু জানতে পারিনি। জানা একান্ত দরকার, কারণ আপনার বাবা এবং আপনাকে আপনাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়া আমার কর্তব্য। আমি নিজে স্বস্তি পাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের রাজ্যে আপনাদের পৌঁছে দিতে না পারছি।

কিন্তু আপনি বললেন না এই জাহাজ দস্যু বনহুরের কিনা?

ও, আপনি এখনও সেই কথা ভোলেননি অরুণা দেবী?

হাঁ, আমি জানতে চাই যে ব্যক্তিকে আপনি কৌশলে হত্যা করেছেন এবং তার দলবলকেও হত্যা করলেন তারা কারা?

অরুণা দেবী, তারা কারা তা আমিও জানি না। আপনি বুড়ো বাবার মুখে শুনেছেন এ জাহাজে আমিও আগন্তুক। আমাকে ওরা এ জাহাজে আশ্রয় দিয়েছিলো।

কিন্তু আপনি তাদের সঙ্গে....

বেঈমানি করেছি।

সে কথা মিথ্যা নয়।

হাঁ, ওরা ঐ মুহূর্তে আমাকে তাদের জাহাজে উঠিয়ে না নিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য ছিলো। কারণ আমি এক অজানা অচেনা পথের যাত্রী ছিলাম। পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছিলাম। পথে শুধু পানি পান করেছি। শুধু পানি পান করে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে। এরা আমার জীবন রক্ষা করেছিলো সেদিন।

তারই প্রতিদান কি তাদের হত্যা করা? যদিও আপনি আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন, সে ঋণ আমরা কোনোদিন ভুলবো না তবুও মনে প্রশ্ন জাগে কেন আপনি জীবনরক্ষাকারীদের জীবননাশ করলেন?

হু কঠিন প্রশ্ন করেছেন অরুণা দেবী। আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। তবুও দিতে বাধ্য হলাম, কারণ আপনার মনে একটা উকুণ্ঠা থাকা আমি ভাল মনে করি না। জীবনরক্ষাকারী হলেও সে বা তারা যদি জঘন্য অন্যায় কোনো কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখা মানব জাতির পরম কর্তব্য। আমি আমার কর্তব্য রক্ষা করেছি।

জীবনরক্ষাকারী বলেও আপনি তাদের ক্ষমা করেননি। সত্যি আপনি বিস্ময়কর পুরুষ। আপনাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি ...

তাই নাকি? যাক ওসব কথা, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন?

বনহুর বললো–রাজা মহেন্দ্র আপনার কাকা এবং তিনি বাস করতেন মন্থনা দ্বীপে, মানে তিনি মন্থনার রাজা ছিলেন, তাই না?

হাঁ! এ কথা আপনি কেমন করে জানলেন?

আপনি যেমন করে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে জেনেছেন তেমনি করে। শুনুন অরুণা দেবী, আমি আরও জানি আপনার বাবা রাজা যোগেন্দ্রনাথ বরেন্দ্র রাজ্যের রাজা। দুই ভাই একই মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করেও দুজনের মানসিকতা, স্বভাব-চরিত্র ছিলো একেবারে বিপরীত।

আপনি এত জানেলেন কি করে? আমার বাবার নাম এবং আমাদের রাজ্যের নাম আপনি কিভাবে জানলেন?

সব বলবো তবে এখন নয়।

আপনি আরও অনেক কথাই জানেন না। কোথায় আপনার দেশ, কি নাম আজও জানতে পারলাম না।

নামের কোনো দরকার আছে কি? দেশ কোথায় জেনেও কোনো লাভ হবে না। শুধু শুধু বিড়ম্বনা বাড়বে। তার চেয়ে এই তো বেশ আছি। ভেসে চলেছি অজানার পথে। হাঁ, শুনেছি বরেন্দ্র রাজ্য সাত সাগর আর তের নদীর পারে। আপনি সাত সাগর আর তের নদী পারের রাজকন্যা! ওকি, আপনার চোখে পানি!

আপনার মনে তো কোনো ব্যথা নেই তাই আমার দুঃখ-ব্যথা আপনি বুঝবেন না। আমি রাজকন্যা নই, হতভাগিনী অরুণা। মা-ভাই-আত্মীয়স্বজন হারিয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি....।

অরুণা দেবী, আপনি মিছামিছি দুঃখ করছেন। এ তো দুদিনের জীবন। আপনার মা ভাই-আত্মীয়স্বজন মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনিও মৃত্যুবরণ করতেন, কিন্তু করেননি। আর করেননি বলেই তো আপনার এত ব্যথা, চোখে জল। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর–আজ জীবনে বেঁচে রয়েছেন বলেই না আপনি

দুঃখ ব্যথা প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছেন। কয়েকটা দিন বা মাস অথবা বছর এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে ফিরবেন। জীবনে কত ঘাত-প্রতিঘাত আসবে, সব মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। না করে কোনো উপায় নেই অরুণা দেবী। সবই সেই সর্বনিয়ন্তার লীলাখেলা। যে ক'দিন বাঁচেন হাসি-খুশিতে জীবনটাকে ভরিয়ে তুলুন। আপনার সেবা দিয়ে, আপনার মহত্ত্ব দিয়ে আপনি আপনার পিতার রাজ্যের জনগণের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন! তাহলে শান্তি পাবেন, স্বস্তি পাবেন। জনতার মধ্যে খুঁজে পাবেন আপনার মা-ভাই-আত্মীয়স্বজনদের।

সত্যি আপনি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন!

জানি না, তবে এই দুনিয়ায় কেউ চিরস্থায়ী নয়। সবাই জন্মেছে আবার মৃত্যুবরণ করবে, কেউ জীবিত থাকবে না চিরকাল। যে যেমন কাজ করে যাবে সে তেমনি ফল ভোগ করবে।

বিশাল বিশ্বে অসংখ্য লোকের ভীড়ে

কে কার মনে রয়।

শুধু বেঁচে থাকে তার কাজ অনন্তকালের স্বাক্ষর হয়ে

নাহি তার ক্ষয়।

আপনি কবিতা জানেন?

মানুষের অন্তরের কথাগুলোই তো কবিতা। সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টি মানুষ। মানুষ হয়ে যদি আমরা মানুষের মত কাজ না করি তাহলে আমরা পশু, জানোয়ার....অরুণা দেবী, আপনার পিতার মহত্ত্বের কথা আমার কানে এসেছিলো এবং তখনই এসেছিলো যখন আপনার কাকা নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলো। একটু থেমে বললো বনহুর–অরুণা দেবী, আপনার কথার মধ্য দিয়ে আমি আপনার বংশ পরিচয় আবিষ্কার করতে পেরেছি। আপনার পিতা রাজা যোগেন্দ্রনাথকে বাঁচাতেই হবে, কারণ প্রজারা তার অভাব কোনোদিনই পূরণ করতে সক্ষম হবে না।

হাঁ, আপনি যা বললেন-সত্য। বাবাকে দেশবাসী খুব শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। কারণ বাবা প্রজাদের নিজ সন্তানের মতই ভালবাসেন এবং তাদের দুঃখ-ব্যথাকে

নিজের বলে মনে করেন। বাবা তো সেই কারণেই হিন্দোল গিয়েছিলেন। হিন্দোল রাজ্যেও আমার বাবার প্রজাগণ বসবাস করেন। কাকার দুর্ব্যবহারে বরেন্দ্র রাজ্য ছেড়ে অনেক প্রজা দেশত্যাগী হয়ে হিন্দোল চলে গিয়ে বসবাস করছে। একটু থেমে বললো অরুণা দেবী-এ কারণেই বাবা কাকাকে মন্থনা দ্বীপ ছেড়ে দেন এবং ঐ দ্বীপের রাজা বানিয়ে দেন।

কিন্তু আপনার কাকা তবুও শান্ত হননি। মন্থনা দ্বীপের রাজা হয়েও তার সেই পশু মনোবৃত্তির এতটুকু উপশম হয়নি। সে মন্থনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই চালিয়েছিলো পশুর মত আচরণ, যার জন্য তাকে ভয়ংকরভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। হাঁ, আপনার বাবা তাহলে হিন্দোল গিয়েছিলেন প্রজাদের দেখবার জন্য?

হাঁ, প্রজাদের দেখবার জন্যই তিনি আমাদের নিয়ে জলপথে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু কে জানতো ভাগ্যে এই দুর্ভোগ ছিলো।

আবার সেই দুঃখ আর ব্যথা! অরুণা দেবী, আমার মনে কি দুঃখ নেই? ব্যথা নেই? সবকিছু মনেই চেপে রেখে যখন যে অবস্থা সামনে আসছে, সেই অবস্থাকে সানন্দে গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া মানুষের করবারই বা কি আছে!

আপনার কথাগুলো আমার মনে চিরকালের জন্য দাগ কেটে রইবে। আচ্ছা আপনি ভাগ্য বিশ্বাস করেন?

একটু হেসে বললো বনহুর–করি। তবে ভাগ্য গড়ে নেয়াটাও মানুষের হাতের মুঠায়। মন যা চাইবে তাই যদি করি তাহলে অনেক কিছুই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে করা যায়। যেমন আপনার বাবা ইচ্ছা করলে আপনার কাকার মত হতে পারতেন কিন্তু তিনি তা হননি। নিজের মনের অসৎ কামনা-বাসনাগুলোকে তিনি পরিহার করে চলেছেন। অনেক কিছু ইচ্ছাই তো মানুষের মনে জাগে আর মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর বিবেক বলে কিছু নেই, সেই বিবেক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে মানুষ। দুষ্ট কুৎসিত বাসনাগুলোকে ত্যাগ করাই হলো মানুষের কাজ। ইচ্ছা করলে মানুষ সৎ হতে পারে, ইচ্ছা করলে মানুষ অসৎ হতে পারে। কাজেই শুধু ভাগ্যের দোহাই দিয়েও রেহাই নেই।

তাহলে বলুন আমার বাবা প্রজাদের মঙ্গলার্থেই হিন্দোল এসেছিলেন এবং প্রজাদের বরেন্দ্র রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য তাদের ধন-সম্পদ দান করেই

ফিরছিলেন তবে কেন এমন হলো? ভাগ্য আমাদের জীবনকে বিপন্ন করলো।

সবকিছুই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলে হয় না। অনেক সময় অনেক কিছু নিজেদের ভুল ভ্রান্তি-ত্রুটির জন্যও ঘটে যায়। হয়তো কোনো এক ভুলের জন্য এই খেসারত দিতে হতে রাজা যোগেন্দ্রনাথকে। ভাগ্য নিয়ে অনেক যুক্তি আছে অরুণা দেবী। আমি যদি একটি মন্দ কাজ করে বলি ঐ কাজ করা আমার ভাগ্যে ছিলো তাই করেছি। তা নয়, সৃষ্টিকর্তার মানুষকে বিবেক দিয়েছেন আর কোনো প্রাণীকে বিবেক দেননি। শুধুমাত্র মানুষ বিবেক-বিবেচনা-জ্ঞান দ্বারা জীবনপথে ভালমন্দ বিচার করে চলতে পারে অন্য কোনো প্রাণী নয়। অরুণা দেবী!

বলুন?

অনেকক্ষণ কথা বলেছি আমরা। আপনার বাবা এবং এ বুড়ো বাবা কি করছে জানি না। ওষুধ পেয়ে খুব ভাল হয়েছে। না হলে ওদের বাঁচানো কষ্টকর হতো।

বাবা আর বুড়ো বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

আমি তাদের ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলাম।

আপনি কিন্তু আপনার পরিচয় দেননি।

কি হবে আর পরিচয়ে। সাগর পাড়ি দিয়ে একদিন যে যার পথে চলে যাবে। এমন অনেক পথিক আসবে যাবে, সবাইকে কি মরে রাখতে পারবেন অরুণা দেবী?

সব কথাই আপনি ভূমিকা করে বলেন। বড় অদ্ভুত লোক আপনি!

এ কথা অনেকবার বলেছেন আপনি।

আজকেই বেশীক্ষণ আপনার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেলাম।

তারপর?

এমনি করে সমুদ্রবক্ষে ভেসে বেড়ালেই তো আর চলবে না। তীরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কি করে তা সম্ভব! কেউ কি জাহাজ চালাতে পারবে।

যারা চালাক ছিলো তারা সবাই মরেছে। যে তিনজন জীবিত আছে তারা জাহাজ চালাতে দক্ষ নয়, একথা তারা বলেছে। তা ছাড়াও তাদের হাতে জাহাজখানাকে ছেড়ে দেওয়া সমীচীন হবে না।

তাহলে?

আমাকেই এ ব্যাপারে কাজ করতে হবে।

জাহাজ চালনা করতে পারেন আপনি?

কিছু কিছু পারি।

কেমন করে পারেন? জাহাজ চালানো তো মুখের কথা নয়, আপনি কি কোনো জাহাজে ক্যাপ্টেন ছিলেন?

না।

তবে?

নাবিক ছিলাম।

আপনি জাহাজে নাবিক ছিলেন?

হাঁ অরুণা দেবী।

কিন্তু আপনাকে দেখে নাবিক বলে মনে হয় না।

কি মনে হয়?

কোনো রাজা বা রাজপুত্র।

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

অরুণা দেবীর দু'চোখে বিস্ময়, লোকটা এমন সুন্দরভাবে হাসে কি করে!

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো–রাজপুত্র বা রাজা এ দুটোর কিছুই আমি নই! অতি নগণ্য সাধারণ একজন মানুষ।

কিন্তু আপনাকে দেখলে সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। আপনার আচরণ অদ্ভুত আপনার কথাবার্তা বিস্ময়কর। আপনি এমন করে হাসেন যা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে।

বনহুর কি যেন ভেবে বললো–অরুণা দেবী, আপনারা রাজা-প্রাসাদের স্বর্ণ আসনে উপবেশন করে সুখময় কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করে বেড়ান। বাস্তব জীবন কেমন, কত কঠিন, কত নির্মম তা জানতেন না বা জানার সুযোগ পাননি। এবার তা সঠিকভাবে অনুভব করলেন। এমনি বহু ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের জীবনকে কঠিন আর মজবুত করে তুলেছে অরুণা দেবী।

আপনি যাই বলুন, আপনার পরিচয় আমার বড় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কারণ একসঙ্গে যখন আছি তখন কি বলে আপনাকে ডাকবো?

যা আপনার খুশি তাই বলে ডাকতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।

তবু আপনার নাম, দেশ জানার খুব ইচ্ছা করছে। বলুন না?

দেশ কান্দাই। আর নাম মনির চৌধুরী।

চমৎকার নাম আপনার! আপনি সত্যি মহান, আমাদের জন্য আপনি যা করেছেন কোনোদিন ভুলবো না। বাবা সব সময় আপনার প্রশংসা করছেন। আপনি মুসলমান আর আমরা হিন্দু তবুও আপনার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ,……

বললো বনহুর–হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে জাতিই বলুন সবাই মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে ঘৃণা করা মহাপাপ, এবং বিচারকর্তার কাছে চরম অপরাধ। আপনার যেমন দেহ-মন আছে, আমারও তেমনি। আপনার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি আছে আমার মধ্যেও আছে, কাজেই আমরা মানুষ, এই আমাদের বড় পরিচয়। তবে যার যা কর্মফল সেই ভোগ করবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, হিংসা-বিদ্বেষ অসৎ-কর্ম এ সব যে কোনো ধর্মবিরোধী কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলুন অরুণা দেবী সত্যি কিনা?

হাঁ, সত্যি।

কি ভাবছেন?

ভাবছি এই তো মানুষ, তাদের মধ্যে কত দ্বন্দ্ব, কত বিবাদ। দেখুন না কিভাবে দস্যু বনহুরের দল আমাদের জাহাজখানাকে ধ্বংস করে দিলো। বনহুরও তো মানুষ, কিন্তু তার আর আপনার মধ্যে কত পার্থক্য।

কেমন?

হৃদয়হীন বনহুর আমার জীবনকে রিক্ত করে দিয়েছে।

আপনার এ ধারণা মিথ্যাও তো হতে পারে।

না মিথ্যা নয়। আমি শুনেছি, দস্যু বনহুর নানা ছদ্মবেশে পৃথিবীময় বিচরণ করে বেড়ায়। তার আসল রূপ কেউ কোনোদিন দেখেনি। জলে-স্থলে এমন কি আকাশেও তার অবাধ গতিবিধি। যত ভয়ংকর নির্মম কাজ সে অনায়াসে নির্দ্বিধায় করতে পারে।

হয় তো সত্য, তাই বলে এই জাহাজে যে জলদস্যু ও তার দলবলকে আপনি দেখলেন সে বনহুর মানে দস্যু বনহুর নাও হতে পারে। কারণ আপনার বর্ণনায় দস্যু বনহুরের সঙ্গে এ জাহাজে যারা ছিলো তাদের দলপতি এবং অনুচরদের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অরুণা দেবী, দস্যু বনহুর কোনোদিন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না বা বিনা কারণে কারও ধনরত্ন কেড়ে নেয় না। আপনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যা শুনেছেন তা সত্য নয়।

কিন্তু…

আপনি ভুল করে এ ধরনের সন্দেহকে মনে স্থান দিচ্ছেন। বনহুর কারও ক্ষতি করে না অরুণা দেবী…

আমার কাকাকে সে যেভাবে হত্যা করেছিলো যদি দেখতেন শুনতেন তাহলে…

কিছু পূর্বেই আপনার মুখে সব শুনলাম। বলেছি তো বিনা কারণে বনহুর তাকে হত্যা করেনি। আপনার কাকা যখন অত্যাচার অনাচারে প্রজাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো-তখন সে তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলো।

কিন্তু তার কি অধিকার ছিলো তাকে ওভাবে হত্যা করার, সে যদি হৃদয়বান হতো তাহলে তাকে সংশোধন হবার সুযোগ দিতো।

অরুণা দেবী, দস্যু বনহুরের নীতি নয় অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য হবার জন্য সময় দেয়া। তাতে প্রচুর সময়ের দরকার এবং সে সময় দিতে গেলে ভুল করা হবে, তাই...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, তাদের সামনে যমদুতের মত রিভলভার হাতে চিয়াংচুর তিনজন অনুচর এসে দাঁড়ায়। তারা এক একজন ভীষণ আর ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

একজন বললো–এবার তোমার জীবন নেবো আমরা...বনহুর যাদের বন্দী করে হত্যা করতে পারতো, তারাই সুযোগ বুঝে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালোলা।

ধীরে ধীরে হাত দু'খানা তুলে ধরলো উঁচু করে। একবার তাকালো বনহুর অরুণা দেবীর মুখের দিকে। অরুণার মুখোভাব ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাবতেও পারেনি হঠাৎ এমন একটা বিপদ আসতে পারে এই মুহূর্তে। অরুণার ভয়ার্ত মুখমন্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। এবার তার বাবা এবং তার মৃত্যু অনিবার্য। বেচারা ভদ্রলোকটাও তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করবে।

বনহুর উঠে দাঁড়াতেই অরুণা দেবীও উঠে দাঁড়ালো।

ওদের হাতের জমকালে রিভলভারগুলো ক্যাবিনের স্বল্প আলোতে চকচক করছে। বনহুর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চিয়াংচুর অনুচরদের হাতের রিভলভারগুলোর দিকে।

পায়ের নিচে কার্পেট পাতা।

বনহুর ভাল করে লক্ষ করলো ওরা তিনজনই কার্পেটের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। অরুণা দেবী ভীত আতঙ্কিত হরিণীর মত বনহুরের পাশে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলছে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মানুষের যে অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

হঠাৎ বনহুর উবু হয়ে কার্পেট ধরে ভীষণ জোরে টান দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো চিয়াংচুর অনুচরেরা। তারা ভাবতেও পারেনি লোকটার মাথায় এমন একটা বুদ্ধি চট করে এসে যাবে। তারা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের রিভলভার ছিটকে পড়লো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে একটা রিভলভার হাতে তুলে নিলো এবং পা দিয়ে আর একটা রিভলভার ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওদিকের আসনের নিচে। অপরটি কার্পেটের তলায় গিয়ে পড়েছে।

অরুণা দেবী হতভম্ব নির্বাক।

বনহুর অত্যন্ত দ্রুত ওদের একজনের বুকে রিভলবার চেপে ধরে বললো– একচুলও নড়বে না, তাহলে আমি তিনজনকেই গুলি করে হত্যা করবো। বিশ্বাসঘাতক, ভেবেছিলাম তোমাদের মুক্তি দিয়ে ভাল করেছি। তোমরা আমাকে তীরে পৌঁছার ব্যাপারে সাহায্য করবে, কিন্তু……বিশ্বাস নেই তোমাদের…..বনহুরের হস্তস্থিত রিভলভার গর্জে উঠলো।

তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো একজন!

বনহুর দ্বিতীয়জনকে গুলি বিদ্ধ করলো, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জন বনহুরের পায়ের কাছে বসে বলে উঠলো–আমাকে হত্যা করো না। আমি শপথ করছি তোমার বিরুদ্ধে আর অস্ত্র হাতে নেবো না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমাকে সাহায্য করবো সর্বতোভাবে।

বনহুর তাকালো অরুণা দেবীর মুখের দিকে।

অরুণা দেবী বললো–ওকে মাফ করে দিন মিঃ চৌধুরী। ও শপথ করছে আপনার। বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না।

বেশ তাই হোক। বনহুর নিজের হাতের রিভলভারখানা থামিয়ে নিলো। তারপর বললো–বেঈমানির সাজা পেয়ে গেলো। আমার ইচ্ছা ছিলো না তোমাদের কাউকে হত্যা করার।

অরুণা বললো–ওরা ভুল করেছে মিঃ চৌধুরী। আপনি সুযোগ পেয়েও ওদের হত্যা না করে মুক্তি দিয়েছিলেন কিন্তু ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো–আমারও মৃত্যু হওয়া উচিত কিন্তু মরতে আমি রাজি নই কারণ আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। তোমরা জাহাজখানাকে সঠিক পথে তীরে নিতে পারবে না। এ সমুদ্রের বুকে পথ চিনে চলা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের দলপতি চিয়াংচুর জাহাজ ছাড়া এদিকে কোনো জাহাজ ভুলক্রমেও আসে না। জলদস্যুদের দখলে এ সমুদ্র…

অরুণা দেবী বলল-জলদস্যু, তোমরা দলপতি চিয়াংচুর লোক?

হাঁ, আমরা জলদস্যু এবং আমাদের সর্দার হলো চিয়াংচু। আমরা সবাই তার গোলাম ছিলাম। এ পথে ভুলক্রমে কোনো জাহাজ এলে আর সে জাহাজ ফিরে যেতে পারেনি। আমরা আমাদের দলপতির নির্দেশক্রমে বনহুরকে চুম্বক মেসিনের সাহায্যে টেনে এনে জাহাজের যাত্রীদের হত্যা করে ধনসম্পদ লুটতরাজ করে নিয়েছি। বহু নারীর……না না থাক আর ওসব পাপ-কথা মুখে আনবো না। মাফ করে দাও, আমি আর পাপ করতে রাজি নই। যাদের তুমি হত্যা করলে ওরাই আমাকে তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে রাজি করিয়েছিলো। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই, আমার বৃদ্ধা মা আছেন, আমার ছোট ভাই-বোন আছে। আমি ইচ্ছা করে এদের দলে আসিনি। এ কাজে আমার কোনোদিন উৎসাহ ছিলো না কিন্তু দারিদ্রের কষাঘাতে আমি এ পথ বেছে নিয়েছিলাম। এ দলে যোগ দিয়ে পাপ আমি অনেক করেছি কিন্তু মনে শান্তি পাইনি। আমার বিবেক আমাকে দংশন করেছে। এখন আমার মন বড় চঞ্চল, পরে সব বলবো আপনাকে। আমার জীবনের কাহিনী আপনাকে বলবো। সমাজের নির্মম আচরণ আমাকে বাধ্য করেছিলো এ পথ বেছে নিতে। আমি চাইনি এমন হতে…আমি সব বলবো, আপনাকে সব বলবো।

বনহুর স্থিরদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলো, ওর কথাগুলো বনহুরের মনে রেখাপাত করলো। মনে পড়লো কালু খাঁর মুখ, বৃদ্ধ মা-বাবার মুখে এক মুঠি ভাত তুলে দেবার জন্য কালু খাঁ বহু স্থানে চাকরির জন্য ধন্না দিয়েছিলো। সবাই তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছিলো সেদিন, এক মুঠি ভাতের জন্য কুলি-মজুরের কাজে গিয়েছিলো কালু খাঁ, সেখানেও তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিলো। কুলি-মজুরের কাজও সেদিন সে পায়নি, তারপর সে বেছে নিয়েছিলো দস্যুতার পথ, কিন্তু কালু খাঁ অন্যায়ভাবে কারও ধনরত্ন ছিনিয়ে নেয়নি যারা সমাজের দুশমন, যারা অসহায় মানুষের রক্ত শোষণ করে ইমারত গড়ে, ধন সম্পদের আকাশচুম্বী পাহাড় তৈরি করে তাদেরকেই কালু খাঁ আঘাত

হানতে...হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, বলে লোকটা-মাফ করে দাও, তুমি আমাকে মাফ করে দাও...

বনহুরের সম্বিৎ ফিরে আসে, বললো সে-বেশ, মাফ করে দিলাম, যাও তোমার সঙ্গীদের মৃতদেহগুলো সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করো। যাও....

অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর–চলুন অরুণা দেবী, আপনার বাবা এবং বুড়ো বাবার খোঁজ নিয়ে আসি। তারা কেমন আছেন দেখি গিয়ে।

পা বাড়ালো বনহুর আর অরুণা সেই ক্যাবিনের দিকে যে ক্যাবিনে অসুস্থ রাজা আর বুড়ো বাবা রয়েছে।

বললো অরুণা দেবী-ওকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হলো? দস্যু যারা তাদেরকে বিশ্বাস করতে নেই।

চলতে চলতে কথা হচ্ছিলো বনহুর আর অরুণা দেবীর মধ্যে।

বনহুর ফিরে তাকালো অরুণার মুখের দিকে, বলল-দস্যু হলেও সে মানুষ এবং তাকে বিশ্বাস করা যায়। অরুণা দেবী, সমাজে যারা স্বনামধন্য যারা নেতৃত্বের আসনে বসে সাধুতার মুখোশ পরে মানুষের কল্যাণের বুলি আওড়ায়, আপনি তাদেরকে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করেন না। তাদের কথার ওপর দেশ ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে কিন্তু আপনি জানেন না তারা দস্যুর চেয়েও ভয়ংকর, তারা হিংস্র জন্তুর চেয়েও মারাত্মক। দস্যুর প্রাণ আছে মন আছে, কিন্তু ওরা-ঐ মুখোশধারী বিড়ালতপস্বী যারা তাদেরকে এতটুকু বিশ্বাস নেই...লোকটা তার ভুল বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো। দেখা যাক কি করে সে।

বনহুর আর অরুণা দেবী ঐ ক্যাবিনের পাশে এসে পড়েছে। ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই দেখলো তার বাবা রাজা যযাগেন্দ্রনাথ শয্যায় উঠে বসে আছেন। পদশব্দে ফিরে তাকালেন তিনি-মা অরুণা!

এই তো বাবা এসেছি! কখন তোমার ঘুম ভেঙেছে?

কিছুক্ষণ হলো।

বনহুর বুড়ো বাবার কাছে এগিয়ে গেলোতোমার এখন কেমন লাগছে বুড়ো বাবা?

ব্যথা অনেকটা কম কিন্তু আমি যে কিছু দেখতে পাই না, কি করে বাঁচবো বলো? কে আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে দেখবে...বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর।

অরুণা তার বাবার পাশ থেকে উঠে এলো এবং বুড়ো বাবার চোখে ওষুধ দিতে দিতে বললো–সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে বাবা। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

*

বনহুর আর অরুণা দেবীর সেবাযত্নে রাজা এবং বুড়ো আরোগ্য লাভ করলো। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো তারা।

বনহুর নিজে জাহাজ চালনা করে চলেছে।

তাকে সহায়তা করছে চিয়াংচুর একমাত্র জীবিত অনুচর লার্ভার্স-মহাথর। বনহুর ওকে মহাথর বলেই ডাকে। সেদিনের পর থেকে মহাথর বড় ভাল লোক বনে গেছে। আসলেই মহাখর মন্দ লোক ছিলো না, তার সমস্ত কার্যকলাপ সৎ ব্যক্তিদের মতো ছিলো।

রাজা বনহুরকে পুত্রসম স্নেহ করেন। প্রাণরক্ষাকারী বনহুর আজ তার জীবনের পরম বন্ধু। অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছেন রাজা। প্রায়ই তিনি বুড়ো বাবার সঙ্গে বসে গল্পসল্প করেন। অনেক কথা হয় দুজনের মধ্যে।

বনহুর জাহাজ চালনায় সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছে মহাথরকে। শান্ত সাগরবক্ষে জাহাজখানা এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। জাহাজে খাদ্যও প্রচুর ছিলো বলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আর কজনই বা জাহাজের যাত্রী তারা।

মহারাজ ও তার কন্যা অরুণা, বনহুর আর বুড়ো বাবা, তাদের সঙ্গে রয়েছে মহাথর। মোট পাঁচজন যাত্রী নিয়ে জাহাজখানা ভেসে চলেছে।

মহাথর পথের নির্দেশ দিচ্ছে। সে পরম বন্ধুর মত বনহুরকে সহায়তা করে যাচ্ছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে মহাথর। জাহাজের ইঞ্জিন থেকে ক্যাপ্টেনের আসন পর্যন্ত ছুটাছুটি করে সে।

ক্রমে মহাথর বনহুরকে ভালবেসে ফেললো। বনহুরের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তার কানে একটা কঠিন শপথের বাণীর পরশ বুলিয়ে দিলো। সে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করছে তাকে।

একদিন বনহুরকে বললো মহাথর-জানি না আপনি কে? কি আপনার পরিচয়। আমি নিজের জীবনের বিনিময়ে আপনার করুণা ভিক্ষা চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি। জলদস্যু চিয়াংচুর সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর কাটিয়েও আমি যে তৃপ্তি বা শান্তি পাইনি তা এ তিন দিনে পেয়েছে। বলুন আপনি কে?

মহাথরের কথায় হাসলো বনহুর।

ইঞ্জিনের লালচে আলোতে-বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখমন্ডল অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো। বললো–মহাথর, তুমি বন্ধু হিসেবে আমাকে তুমি বলেই সম্বোধন করো। হঠাৎ করে আপনি বড় বেখাপ্পা লাগছে আমার কাছে। আমি আর তুমি একই মানুষ, একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। যেদিন আমি সমুদ্রতীর ধরে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় এগিয়ে চলেছিলাম সেদিন তোমরা যদি আমাকে তোমাদের জাহাজে তুলে না নিতে তাহলে হয়তো এতদিন এ পৃথিবীর মায়া আমাকে পরিহার করতে হতো। তোমাদের দলপতিকে আমি হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু আমি অনুতপ্ত। মহাথর, তুমি আমার পরিচয় মানুষ হিসেবেই পাবে, এর বেশি কিছু না জানাই শ্রেয়।

বললো মহাথর-আপনার পরিচয় নাই বা জানলাম। মানুষ হিসেবেই আপনাকে আমি গ্রহণ করছি, তবে কিছু কথা আমি না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

তাতে উপকার কি হবে তোমার মহাথর?

জানি না, তবে আপনার মত দেবতুল্য মানুষের কাছে মন চায় অন্তরের জ্বালাময় কথাগুলোকে বলতে। অনেক কথা যা কাউকে কখনও বলিনি।

বেশ বল। জাহাজের হ্যান্ডেল চেপে ধরে বনহুর তাকালো সাগরবক্ষে সীমাহীন জলরাশির দিকে।

মহাথর ইঞ্জিনের গহ্বরে কয়লার চাপ নিক্ষেপ করছিলো, এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কপালের ঘাম মুছে বললো–আমি যখন তরুণ তখন আমার বাবা মৃত্যুবরণ করলো। বৃদ্ধা মা আমাকে তার জীবনের শেষ সম্বল হিসেবে বুকে

আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলেন। কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। মা বললেন, বাবা, একটা চাকরি জুটিয়ে নাও। তোমার বাবা চিরকাল দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে মারা গেলেন। হাঁ, আমার বাবা শ্রমিক ছিলো, কয়লাখনিতে শ্রমিকের কাজ করতো। জন্মাবার পর যখন থেকে জ্ঞান হলো বাবাকে কালিমাখা অবস্থায় দেখেছি। সারাটা দিন বাবা খনিতে কাজ করতো, সন্ধ্যার পর ভো বাজলে বাবার ছুটি হতো। আমি আর আমার মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতাম। বাবা ফিরলে উনুনে আগুন জ্বলবে। মানে বাবা চাল, ডাল গামছায় বেঁধে বাড়ি ফিরতে আর মা তাই রান্না করে আমাকে আর বাবাকে খেতে দিতো। ইস, তখন কত না আনন্দ হতো। উনোনের পাশে বসে বাবা গল্প করতো আর মা রান্না করতো। আমি ল্যাম্পের আলোতে দুলে দুলে স্কুলের পড়া পড়তাম। তারপর রান্না হলে মা আমাদের সামনে ভাতের থালা রেখে ল্যাম্পটা সরিয়ে দিয়ে বলতো-খেয়ে নাও তোমরা…যাক সে সব দিনের কথা। যা বলছিলাম, বাবা হঠাৎ অসুখে পড়ে মারা গেলো। মা বড় অসহায় অবস্থায় পড়লো। আমি বাবার লাশটার পাশে বসে ল্যাম্পের আলোতে মাকে দেখছিলাম। কেঁদে কেঁদে মায়ের চোখ ফুলে গেছে, চুলগুলো পেকে কখন সাদা হয়ে গিয়েছিলো। বড় দুঃখ হলো, বাবার সমাধিকাজ সম্পন্ন করে ফিরে এলাম মায়ের পাশে। ক'দিন যেতে না যেতে অভাব রাক্ষসী হানা দিলো ভীষণভাবে। মা লোকের বাড়ি কাজ করতে গেলো এক মুঠো ভাতের জন্য।

একটু থামলো মহাথর, মুখমন্ডলে তার বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে।

বনহুর তার কাজের ফাঁকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো মহাথরকে। সত্যি তার মনে অনেক ব্যথা-দুঃখ জমা হয়ে আছে।

মহাথর বলছে–বৃদ্ধ মা সারাদিন পরিশ্রম করে চারটি অন্ন যোগাতো। তাই মা-ছেলে মিলে খেতাম। কোনো দিন পেট পুরে, কোনো দিন আধ পেট।

লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম, গরীবের ঘোড়া রোগ কেন। লেখা-পড়া অসহায় অনাথের জন্য নয়। লেখাপড়া করতে গেলে চাই অর্থ, বই, কাগজ, কলম তাই যোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয়, তারপর আছে স্কুল-কলেজের মাইনে, পেটে অন্ন না থাকলে পড়া হয় না। একদিন মায়ের মুখের দিকে চেয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে মজুরের কাজে নেমে পড়লাম। সেখানে বিতাড়িত হলাম, শ্রমিকদের সঙ্গে আমার খাপ খেলো না। তারা আমাকে নানা ছুতায় তাড়িয়ে দিলো। ফিরে এলাম মায়ের পাশে, মা অসুস্থ। ওষুধ কেনার পয়সা নেই, পেটে দানাপানি নেই। এমন কি

মায়ের পথ্য জোগাড় করতেও পারলাম না। চাকরির খোঁজে ধন্না দিলাম নানা জায়গায়, কিন্তু চাকরি গরীবের জন্য নয়। সামান্য চাকরি পেতে হলে কর্মকর্তাদের সেলামি দিতে হবে হাজার কয়েক টাকা। যেখানে মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে পারছি না সেখানে আমি কোথায় পাবো হাজার কয়েক টাকা। তাই বিমুখ হয়ে ফিরে এলাম রুগ্ন মায়ের শয্যার পাশে।

বনহুরের কানে কথাগুলো তীব্র হয়ে বাজছিলো। সে অন্তর দিয়ে অনুভব করছিলো মহাথরের কথাগুলো, কত দুঃখ আর ব্যথা জমাট বেঁধে আছে ওর মনে। এমনি হাজারো মানুষ আছে যারা আজ সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত, বিতাড়িত। এক মুঠি অন্নের জন্য কেউ ভিক্ষা করছে, কেউ কুলি-মজুরের কাজ বেছে নিয়েছে, কেউ বা চোর-বদমাইশ বনে গেছে। সমাজ এদের মানুষ হবার সুযোগ করে দেয়নি। কিন্তু সে সমাজ কাদের? ঐ ধনকুবের যারা, স্বনামধন্য ব্যক্তি যারা, যারা হীনহীন মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গদিতে বসে সাধু বনে গেছে। বনহুরের হাত দু'খানা হ্যাঁভেলের ওপর শক্ত হয়ে ওঠে। ঐ মুহূর্তে সাধুতার মুখোশধারী নরপশুদের গলা দুহাতে টিপে ধরতে পারলে যেন সে স্বস্তি পায়, শান্তি পায়।

বলছে মহাথর–রুগ্ন মাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আমার জীবনে এলো পরিবর্তন। দলদস্যু চিয়াংচু আমাকে বন্ড লিখিয়ে কয়েক হাজার টাকা দিলো। আমি সেই টাকা নিয়ে মায়ের পাশে ফিরে গেলাম, কিন্তু......মা তখন আর জীবিত নেই.....তারপর থেকে আমি জলদস্য মহাথর...একটু থেমে বললো সে-আমার জীবনের সব কথা তোমাকে বললাম। তুমি যেই হও আমাকে তাড়িয়ে দিও না। আমি তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, চিরদিন তাই থাকবো।

বললো বনহুর–বেশ তাই হবে। তুমি আমার বন্ধুই থাকবে সব সময়ের জন্য।

সত্যি বলছেন?

হাঁ সত্যি, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।

এমন সময় অরুণা দেবী ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে, বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে-দূরে একটি জাহাজ দেখা যাচ্ছে।

বনহুর অরুণা দেবীর ওপর এই দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলো। সে ডেকে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে চারদিকে লক্ষ রাখবে। কোথাও কোনো জাহাজ বা ঐ ধরনের কোনো কিছু পরিলক্ষিত হলে ইঞ্জিন ক্যাবিনে সংবাদ দেবে। রাজকন্যা হলেও তাকে এ কাজের দায়িত্বভার দিয়েছিলো বনহুর। অরুণা এ জন্য কিছু মনে করেনি কারণ জাহাজের লোকসংখ্যা সামান্য, তাও আবার তার পিতা এবং বুড়ো বাবা কাজে অক্ষম। কাজেই অরুণা এর চেয়ে কঠিন কাজ হলেও করবে বলে মনস্থির করে নিয়েছিলো। বিশেষ করে তারা সাগরবক্ষ থেকে উদ্ধার পেতে চায়।

বনহুর তাকালো অরুণার মুখের দিকে, বললো–জাহাজ দেখা যাচ্ছে? কি জাহাজ-যাত্রীবাহী না মালবাহী?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার অন্ধকার সাগরবক্ষ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাই……অরুণা দেবী, কথাটা বলে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

বনহুর বললো–অরুণা দেবী, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না এ জাহাজ কাদের এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে এ সাগরে এগুচ্ছে।

আমি লক্ষ করবো মিঃ চৌধুরী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অরুণা কথাটা বলে চলে গেলো।

অরুণা দেবী বনহুরকে নিশ্চিন্ত হতে বললেনও বনহুর কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলো না, তার মনে একটা উদ্বিগ্নতার ছায়া পড়লো। রাত্রিকালে জাহাজখানা কি মতলব নিয়ে এগুচ্ছে কে জানে!

বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো।

বনহুর প্রতীক্ষা করছে অরুণা দেবী আবার কি সংবাদ নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো অরুণা দেবী ফিরে এলো না।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখলো জমকালো পোশাকপরা দুটি লোক রিভলভার হাতে ইঞ্জিনকক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ করলো ওদের। হাতের রিভলভার দুটি চকচক করছে। বনহুর আরও বুঝতে

পারলো ওরা পুরুষ নয়-নারী। বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। জাহাজের হ্যান্ডেলে হাত রেখেই বললো–ও জাহাজখানা তাহলে পুরুষ জলদস্যুদের নয়, নারীদের?

একজন বললো–শুধু নারী নয়-দস্যুনেত্রী……

অপর জন্য কিছু ইংগিত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে ফুঁ দিলো প্রথম নারী।

অমনি পাঁচ দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক ক্যাবিনে প্রবেশ করে ঘিরে ফেললো বনহুর আর মহাথরকে। দু'জন বনহুরকে সরিয়ে দিয়ে জাহাজের হ্যান্ডেল ধরলল, মহাথরকেও সরিয়ে দিলো তার জায়গা থেকে।

বনহুর নিশ্চুপ রইলো।

সে বাধা দিলো না ওদের কাজে। এরা যে ঐ জাহাজের লোক তাতে কোনো ভুল নেই। দেখতে চায় বনহুর এদের উদ্দেশ্য কি। সাগরবক্ষে কেনই বা বিচরণ করে ফিরছে। অরুণা দেবী তাকে সংবাদ দেবার পর আর ফিরে আসার সুযোগ পায়নি। জাহাজখানা নিঃশব্দে দ্রুত গতিতে এগিয়ে এ জাহাজখানার পাশে ভিড়িয়ে তারা উঠে পড়েছে। অরুণা এখন ওদের হাতে বন্দী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা কারা?

বনহুরকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো ওরা।

মহাথরকেও ওরা রেহাই দিলো না। বনহুরের সঙ্গে বেঁধে নিলো। বৃদ্ধ রাজা ও অরুণা দেবীকেও ওরা তাদের জাহাজে তুলে নিলো, তাদের সঙ্গে বুড়ো বাবাও বাদ পড়লো না। সবাইকে তুলে নিলো সেই বিস্ময়কর জাহাজটিতে। ওদের মধ্যে শুধুমাত্র দু'জন নারী অদ্ভুত পোশাক পরিহিতা, আর সবাই পুরুষ।

অদ্ভুত পোশাক পরিহিতা নারী দু'জনের নির্দেশে তাদের কয়েকজন লোক চিয়াংচুর জাহাজখানা চালনা করে নিয়ে চললো। অনেক ধন-সম্পদ এ জাহাজে আছে, কাজেই এ জাহাজখানাকে তারা সাগরবক্ষে তলিয়ে দিতে পারে না।

একটা ক্যাবিনে বনহুর, রাজা, মহাথর আর বুড়ো বাবাকে বন্দী করে রাখা হলো, অপর এক ক্যাবিনে অরুণা দেবীকে।

*

গভীর রাত।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা।

পাশাপাশি দু'খানা যন্ত্রদানব মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। বনহুর তার ক্যাবিনে বন্দী অবস্থায় নতুন কোনো কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

তার রহস্যময় জীবনে কত বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা প্রতি মুহূর্তে ঘটছে তার কোনো হিসাব নেই। বনহুর মনে মনে হাসছিলো। নতুন এক অবস্থার সম্মুখীন এখন তারা। ইচ্ছা করলে বনহুর নারীদ্বয়কে পরাজিত করে তার দলবলকেও কাহিল করতে পারতো কিন্তু সে ইচ্ছা করেই তা করেনি। ব্যাপারখানা রহস্যময়, তাই চুপ ছিলো বনহুর।

বনহুরের চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যায়। মাথুন দ্বীপে মনিরা, রহমান ও তার দলবল তারই সন্ধানে হয়তো উম্মাদের মত চষে ফিরছে। হয়তো বা তারা প্রতীক্ষা করছে সেই আগ্নেয়গিরি মুখ গহ্বরের পাশে। হঠাৎ যদি ফিরে আসে সে ঐ অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। হয়তো বা প্রতীক্ষা করে করে একদিন হতাশ হয়ে ফিরে গেছে তাদের ডুবুজাহাজে। তারপর কান্দাই। যদি সত্যি ওরা ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে মঙ্গল, নইলে বিপদের সম্মুখীন হবে তারা। রহমান তাদের সঙ্গে আছে, আর মনিরাও বুদ্ধিমতী, নিশ্চয়ই সেই অদ্ভুত জনপ্রাণীহীন দ্বীপে তারা অপেক্ষা করবে না। ফিরে গিয়েই রহমান মনিরাকে পৌঁছে দেবে তার মায়ের পাশে। মায়ের কথা মনে হতেই বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে...কতদিন সে মাকে দেখেনি।

হঠাৎ তার ক্যাবিনের দরজা খুলে যায়।

দু'জন লোক প্রবেশ করে, তাদের হাতে উদ্যত রাইফেল। একজন বললো– একে নিয়ে চলল। খুব সতর্কভাবে নিয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা। বললো অপরজন।

বনহুরকে নিয়ে এলো তারা একটি অদ্ভুত ধরনের ক্যাবিনে। তাকিয়ে দেখলো বনহুর, ক্যাবিনের দেয়ালে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত আছে। ক্যাবিনে কোনো জানালা না থাকায়। ক্যাবিন অন্ধকার।

দরজার দুপাশে দপ দপ করে দুটি মশাল জ্বলছে। মশালের দীপ্ত আলোতে ক্যাবিন আলোকিত।

সামনে দুটি লৌহ আসন।

দুটি আসনে দুজন আলখেল্লাধারী উপবিষ্ট।

বনহুরের চিনতে বাকি রইলো না এরা দু'জনই সেই রিভলভারধারী অদ্ভুত পোষাকধারী নারীমূর্তি।

বনহুরের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। সে ভালভাবে চারদিকে লক্ষ করে দৃষ্টি স্থির করলো-সামনের আসনে উপবিষ্ট নারী দু'জনের দিকে। মুখোশে ঢাকা দুটি মুখ, সমস্ত দেহে জমকালো পোশাক। শুধু তাদের চোখ দুটো মশালের লালচে আলোতে চক চক করছে।

বনহুর কুর্ণিশ জানালো।

একজন হাত উঁচু করে কিছু ইংগিত করতেই দু'জন লোক বনহুরের চোখ দুটো কালো কাপড়ে বেঁধে দিলো।

অবাক হলো বনহুর কিন্তু কিছু বলল না।

একজন নারী বললো–আমাদের ভুল হয়েছে। এ ব্যক্তি সে নয়। দলদস্যু চিয়াংচুর অনুচর এরা।

বনহুর আরও বিস্মিত হলো, চিয়াংচুকে এরা চেনে তাহলে! আর এরা যে চিয়াংচুর জাহাজখানার সন্ধানই করছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর বললো–চিয়াংচু আমার জীবন রক্ষাকারী, তবে আমি তার অনুচর নই। তোমরা ভুল করেছে।

প্রথম আসনে যে উপবিষ্ট সে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনুচরদের ইংগিত করলো।

সবাই ক্যাবিন ত্যাগ করলো।

এবার নারীমূর্তি তার সঙ্গিনীকে বললো–তুমি বাইরে যাও কিছুক্ষণের জন্য, আমি ওর ঙ্গে কিছু কথা বলবো।

সঙ্গিনী তার আসন ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো।

এবার প্রথম আসনে উপবিষ্ট নারী নেমে এলো তার আসন থেকে, তারপর বললো–জলদস্যু চিয়াংচুর জাহাজে তোমাকে দেখবে কোনো দিন ভাবতেও পারিনি। এ জাহাজে কেমন করে এলে তুমি?

বনহুর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

তারপর বললো–যতই আলখেল্লার নিচে আত্মগোপন করে থাকে না কেন, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি! দস্যু বনহুরের চোখে ধুলো দেয়া সহজ।

নারীমূর্তির মুখমন্ডল দেখা যাচ্ছিলো না, হয়তো দেখতে পেলে বেশ বোঝা যেতো তার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। নিজকে কিছুটা সংযত করে নিলো নারীমূর্তি, তারপর বললো–আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করলাম তার জবাব দাও?

তুমি যে কারণে এ জাহাজের সন্ধান করছিলে আমি সে কারণে এ জাহাজে আসিনি ভাগ্য আমাকে জলদস্যু চিয়াংচুর জাহাজে নিয়ে এসেছিলো এবং যে কাজ তুমি করবে বলে জলদস্যু চিয়াংচুর সন্ধান করছিলে আমি তা সমাধা করেছি।

বনহুর।

হাঁ। আমি জলদস্যু চিয়াংচুকেই শুধু হত্যা করিনি, তার সমস্ত দলবলকে নিঃশেষ করেছি, শুধু দু’জনকে আমি হত্যা করিনি।

কারণ?

এরা আমাকে আমার কাজে সহায়তা না করলে হয়তো আমি বিফলকাম হতাম। একজন বুড়ো বাবা অপরজন মহান।

এরা চিয়াংচুর অনুচর?

হাঁ।

তবু তাদের ক্ষমা করেছো?

বললাম তো এদের সহযোগিতা ছাড়া আমার...

বুঝতে পেরেছি বনহুর।

ওরা আমার ক্যাবিনেই আটক আছে। একজন সম্পূর্ণ অন্ধ আর একজন মহাথর যুবক।

অপর ব্যক্তি এবং মহিলাটির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক? লোকে বলে তুমি নির্মল চরিত্র,.....

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো–লোকে বলে, এ কথা সত্য কে বললো তোমাকে। তবে আমার সঙ্গে আরও এক ব্যক্তি আছেন, তিনি বরেন্দ্ররাজ্যের রাজা যযাগেন্দ্রনাথ ও তার সঙ্গে রয়েছে তার কন্যা অরুণা দেবী। এরা জলদস্যু চিয়াংচুর শিকার.....

আলখেল্লাধারিণী কিছু ভাবলো, তারপর বললো–তোমার সঙ্গে আরও কিছু কথা আছে তবে এখন নয়, পরে।

নারীমূর্তি হাতে তালি দিলো, সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরদ্বয় এবং দ্বিতীয় নারীমূর্তি প্রবেশ করলো।

প্রথমা নারীমূর্তি ইংগিত করলো বনহুরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

নারীমূর্তির নির্দেশ পালন করলো অনুচরদ্বয়।

প্রথমা আবার ফিরে এলো তার আসনে।

দ্বিতীয়া বসলো তার পাশে।

বললো দ্বিতীয়া-লোকটির পরিচয় তুমি জানো। তার সঙ্গে তোমার বেশ কিছু সময় আলাপ হওয়ায় আমার সেই বিশ্বাস জনেছে।

হাঁ, তাকে চিনি, শুধু চিনিই না, তার আসল পরিচয় জানি। তুমিও ওকে চিনবে কিন্তু এখন আমি তোমাকে ওর পরিচয় জানাতে রাজি নই। যাও হীরা, ওর হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলল।

এ তুমি কি বলছে! জলদস্যু চিয়াংচুর একজন অনুচরকে তুমি গ্রেপ্তার করেও আবার মুক্ত করে দেবে?

সে জলদস্যু চিয়াংচুর অনুচর নয়। যা বললাম শোনো।

বেরিয়ে গেলে প্রথমার সঙ্গিনী।

বনহুরের হাত দু'খানা মুক্ত করে দেওয়া হলো। মহাথরকেও মুক্ত করা হলো। তাদের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ক্যাবিনে রাখা হলো। ভাল সুস্বাদু খাবার দেয়া হলো খেতে।

বৃদ্ধ রাজা ও অরুণা দেবী অবাক হলো, তারা ভাবতেও পারেনি এরা তাদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করবে। মহাথর ও বুড়ো বাবাও বিস্মিত, কারণ তারা ভেবেছিলো এখানে তাদের ওপর নতুন ভাবে নির্যাতন চালানো হবে। কিন্তু তারা যে ব্যবহার পেলো তাতে তারা বিস্মিত হলো।

টেবিলে নানাবিধ খাদ্যসম্ভার।

বনহুর, মহারাজ এবং অরুণা দেবী একই টেবিলে খাচ্ছিলো।

সবার চোখে বিস্ময়।

বন্দী তারা, এভাবে আদর আপ্যায়ন করা হবে এটা আশা করেনি কেউ। বিশেষ করে মহারাজ যোগেন্দ্রনাথ ও রাজকন্যা অরুণা দেবী বেশি অবাক হয়েছেন। নতুন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে ভেবেছিলেন তারা কিন্তু এমন আচরণ তাদের হতবাক করলো।

বনহুর নীরব।

সে জানে কেন তাদের এভাবে আদর আপ্যায়নে ভূষিত করা হচ্ছে। কেন তাদের বন্দী করেও মুক্তি দেয়া হলো। বনহুর মনে মনে হাসে। রাজা এবং অরুণা দেবীর কাছে কোনো কথা ব্যক্ত করে না বনহুর।

এমন সময় অরুণা দেবী বলেই বসলো-মিঃ চৌধুরী, এভাবে এরা আমাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করবে ভাবতে পারিনি। এর কারণ ভেবে পাচ্ছি না আমি।

বনহুর বললো–মহারাজ ও আপনার পরিচয় ওরা জানতে পেরেছে, সেই কারণেই হয়তো……কথা শেষ করে না বনহুর।

জাহাজ দু'খানা একই সঙ্গে এগুচ্ছিলো।

বনহুর পাশের শাশী দিয়ে চিয়াংচুর জাহাজখানার দিকে তাকালো। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো সে। হয়তো চিয়াংচুর হিংস্র চেহারাখানাই ভাসছিলো তার চোখের সামনে। এখনও এ জাহাজে চিয়াঙচুর রক্তের দাগ জমাট বেঁধে আছে। শুধু চিয়াংচুই নয়, তার অনুচর যারা বনহুরের হাতে নিহত হয়েছে তাদের রক্তের ধারাও শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। অভিশপ্ত জাহাজ ওটা……।

বললো অরুণা-কি ভাবছেন মিঃ চৌধুরী?

অরুণা দেবীর কথায় বনহুরের দৃষ্টি চিয়াংচুর জাহাজখানা থেকে ফিরে এলো ক্যাবিনের মধ্যে! বললো বনহুর–ভাবছি চিয়াংচুর জাহাজখানার কথা। বেচারা চিয়াংচুর সমস্ত আশা ভরসা, স্বপ্ন বিনষ্ট হয়ে গেলো। ভেবেছিলাম হুমায়রা দ্বীপ থেকে বরাহ দ্বীপ পর্যন্ত সমস্ত ভুয়া সাগরে সে বিচরণ করে ফিরবে। সমস্ত চীন সাগরে সে চালাবে দস্যুতা কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেলো…

চিয়াংচুর জন্য আপনার অনেক দুঃখ হচ্ছে মিঃ চৌধুরী?

বনহুর জবাব দেবার পূর্বেই বললেন রাজা যযাগেন্দ্রনাথ-যে কোনো ব্যক্তির জন্যই যে কোন মানুষের অনুভূতি থাকা দরকার আছে। মা অরুণা, জলদস্যু চিয়াংচুর ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেলো সেজন্য দুঃখ হবার কথাই বটে।

বাবা, তুমিও মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে চিয়াংচুর জন্য অনুতপ্ত? আর একটু হলেই আমরা তার হাতে মৃত্যুবরণ করতাম একথা ভুলে গেলে?

না মা ভুলিনি, কিন্তু সে একজন মানুষ, সে ভালও তত হতে পারতো। মা অরুণা, শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন নিষ্পাপ পবিত্র একটি ফুলের মত নির্মল থাকে। তারপর যখন সে ধীরে ধীরে বড় হয়, বিবেক-বুদ্ধি মাথায় আসে তখন তার মনে জন্ম নেয় লোভ-লালসা, হিংসা পিপ বাসনা অনেক কিছু। সেই নির্মল পবিত্র শিশুই একদিন পরিণত হয় নরপশুতে। তার লোভ-লালসা তাকে দানবে পরিণত করে।

নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সময় কাটতে লাগলো।

জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তিদ্বয় নিজস্ব ক্যাবিন ছাড়া বাইরের ডেকে কোনো সময় আসে না। তাদের অনুচরগণ সমস্ত জাহাজে ছড়িয়ে আছে। জাহাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত, ঝক ঝক একটানা শব্দ, তার সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন।

পাশে কিছু ব্যবধানে এগুচ্ছে চিয়াংচুর জাহাজখানা।

*

বনহুর ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলো সমুদ্রের উচ্ছল জলরাশির দিকে। জমাট অন্ধকার, আকাশে অগণিত তারকারাজির কিছু আলো সাগরক্ষ কিছুটা দীপ্ত করে তুলেছিলো। বনহুর ডেকে হেলান দিয়ে ভাবছিলো কিছু।

এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ালো কেউ।

বনহুর ফিরে তাকালো, কিন্তু চমকে উঠলো না।

সে প্রতীক্ষা করলো একটি কণ্ঠস্বরের।

কিন্তু কথা নয়, পিঠে ঠান্ডা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করলো। ভালভাবে লক্ষ করলো বনহুর, এ সেই নারীমূর্তি যার নির্দেশে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শুধু তাকে নয়, মহারাজা ও তার কন্যা অরুণাদেবীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তারা এখন বিনাদ্বিধায় ক্যাবিনে চলাফেরা করতে পারে।

বনহুর বললো–হঠাৎ কি মনে করে?

বনহুর, তোমার হাত দু'খানা মুক্ত করে দিয়েছি বলে তোমাকে রাতের অন্ধকারে এই মুক্ত ডেকে এসে দাঁড়াবার অনুমতি দেয়া হয়নি। তোমাদের আমি একটা গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

হাসলো বনহুর, অদ্ভুত সে হাসি।

জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি বললো–ইচ্ছা করলে তোমাকে হত্যা করতে পারতাম......

কিন্তু তা করতে পারবে না, কারণ এত বড় দুঃসাহস তোমার নেই।

বনহুর!

বলো যা বলতে চাও?

অনেকবার তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম আমার রাজ্যে তুমি প্রবেশ করবে না। চিয়াংচুর জাহাজে হামলা দেয়ার অধিকার তোমার ছিলো না। তুমি আমাকে যা বলেছে তা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি আর কোনোদিন তুমি আমার পথে এসে দাঁড়াবে না।

আমি তোমার পথে এসে দাঁড়িয়েছি না তুমি আমার পথে এসে পথরোধ করার চেষ্টা করছো? সত্যি তুমি নারী হলেও বাহাদুর বটে, তবে চিয়াংচুর জাহাজখানার অধিকারী আমি, কারণ জয় আমিই করেছি আর তুমি এসেছো গোপনে সিদেল চোরের মত।

বনহুর! তোমার দুঃসাহস তো কম নয়। আমার মুখের ওপর তুমি এমন কথা বলতে। পারলে? ইচ্ছা করলে তোমার হাত-পা বেঁধে তোমাকে সাগরে নিক্ষেপ করতে পারি।

বলেছি তো পারবে না, আর পারবে না বলেই তো আমাকে তুমি তোমার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। চিয়াংচুর জাহাজ আমার দখলে ছিলো, তুমি তা কৌশলে হাত করেছে। আমার আপত্তি নেই, তবে একটি জিনিস আমি চাই তা হলো চুম্বক মেসিন যার মূল্য কোটি কোটি টাকা। তবে হাঁ, আমি তার মূল্য তোমাকে দিয়ে

দেবো। কারণ চিয়াংচুর জাহাজখানা এখন তুমি নিজের আয়ত্তে রেখেছে। আমি তোমার বুদ্ধিমত্তার মূল্য দেবো...

কিন্তু ঐ চুম্বক মেসিনটাই আমারও প্রয়োজন বনহুর। যার জন্য আমি চিয়াংচুকে ফলো করে আসছি আজ কয়েক মাস ধরে। বনহুর, এ মুহূর্তে আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, তুমি ফিরে যাও নিজের ক্যাবিনে।

বনহুর বললো–এখন আমি তোমার জাহাজে অবস্থান করছি। তুমি আমাকে যেভাবে চলতে বলবে আমি তাই চলবো। বেশ, তুমি যদি বলো এই মুহূর্তে আমাকে আমার ক্যাবিনে ফিরে যেতে, তাই হবে।

বনহুর ডেক থেকে নিজের ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালো।

জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তিও তার সঙ্গে পা ফেললো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর জমকালো পোশাক পরিহিতা মহিলার রিভলভারসহ হাতখানা বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত নারী হেসে উঠলো এবং বাম হস্তে রিভলভারের মুখখানা বনহুরের পাঁজরে চেপে ধরে বললো–বনহুর, তুমি নিজকে যত বুদ্ধিমান মনে করো, আসলে কি সত্যিই তুমি......

হাঁ আমি স্বীকার করি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তাই বলে আমি তোমার কাছে হেরে যাব, এ কথা ভাবতে পারো?

তাহলে কি আমি হেরে যাবো তোমার কাছে?

এই তো এই মুহূর্তে তুমি আমার কাছে পরাজিত হলে মাদাম বাঈ।

আমি, আমি মাদাম বাঈ এ কথা কে বললো তোমাকে বনহুর!

হাসলো বনহুর, তারপর বললো–তুমি বাঈজীর ছদ্মবেশে আমার পুত্র নুরকে সহায়তা করেছে সে জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

তুমি কি মনে করো নূরকে সাহায্য করার জন্যই আমি বাঈজীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলাম?

না। তোমার কর্তব্য তুমি পালন করেছিলে? আমার অবর্তমানে নূর হয়ত কৃতকার্য নাও হতে পারতো?

তাহলে তুমি স্বীকার করো?

হ্যাঁ, করি, আর করি বলেই তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব স্থাপনে সম্মতিজ্ঞাপন করেছি।

চলো তোমাকে তোমার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চলো।

*

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করে দেখলো মহাথর ঘুমিয়ে পড়েছে। বনহুর নীরবে শয্যাগ্রহণ করলো, ওপাশে মহারাজ আর বুড়ো বাবার নাসিকাধ্বনি হচ্ছে। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে অঘোরে।

অরুণা দেবীকে অপর এক ক্যাবিনে যত্নসহকারে রাখা হয়েছে। এ জাহাজে আসার পর হতে তেমনভাবে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি বনহুরের। বনহুর ও তার সঙ্গীদের যখন বন্দী করে এ জাহাজে আনা হয় তখন সে দেখতে পেয়েছিলো পিতা-কন্যাকে অস্ত্রে মুখে ধরে নিয়ে আসা হলো। এরপর জানে না বনহুর অরুণা দেবী কোথায়। তবে অনুমান করেছে সে, অরুণা দেবীর কোনো অযত্ন হয়নি এ জাহাজে।

এ জাহাজখানা বৃহৎ আকার। চিয়াংচুর জাহাজের তুলনায় এ জাহাজ দ্বিগুণ বলা যায়। বনহুর সমস্ত জাহাজখানা দেখার সুযোগ পায়নি। সবার অলক্ষ্যে ডেকে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই বিস্ময়কর নারীমূর্তি এসে হাজির হয়েছিলো তার পাশে। যদিও সে নিজকে অতি সাবধানে গোপন করে রেখেছিলো তবুও বনহুর তাকে চিনতে ভুল করেনি। মাদাম বাঈ বেশে সে একদিন কান্দাই শহরে আবির্ভূত হয়েছিলো, এবং সে নূরের কাজে সহযোগিতা করেছে। বনহুর সব সংবাদ অবগত আছে। খুব চতুর এই জমকালো পোশাক পরিহিতা নারীমূর্তি।

বনহুর অনেক কিছু ভাবছে, হঠাৎ একটা নীলাভ আলোকরশ্মি দেখতে পেলো ক্যাবিনের জানালাপথে। দ্রুত উঠে এলো বনহুর জানালার ধারে। ক্যাবিনে সবাই

ন্দ্রিামগ্ন, বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললো জাহাজের পেছন অংশে, যেদিক থেকে নীলাভ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছিলো।

অবাক হলো না বনহুর।

কারণ সে জানতে এ জাহাজখানা সাধারণ নয়। এর ভেতরে রয়েছে গভীর রহস্য। বনহুর সেই রহস্য উদঘাটন করতে চায় এবং সে কারণেই নিশ্চুপ হয়ে মেনে নিচ্ছিলো জমকালো পোশাক পরিহিতার প্রাধান্য। বনহুর দেখলো জাহাজের পেছন অংশের কিছু জায়গা ফাঁক হয়ে গেলো এবং সেই ফাঁক দিয়ে একটা আলো জাহাজের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়লো। একটা রকেট ধীরে ধীরে সেই ফাঁক দিয়ে ডেকের ওপর বেরিয়ে এলো।

বনহুরের চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো। বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে সে। রকেট জাতীয় বস্তুটি একটি বিস্ময়কর যান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যানটির তলদেশ দিয়ে এক ধরনের নীল আলো বেরিয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বিস্ময়কর যানটির পাশে এসে দাঁড়ালো জমকালো পোশাক পরিহিতা সেই নারীদ্বয়।

একজনের হাতে একটি মুখোশের মত বস্তু।

বনহুর লক্ষ করলো যার হাতে মুখোশের মত বস্তুটি রয়েছে সেই নারী প্রথমা। দ্বিতীয়া প্রথমার চেয়ে লম্বায় কিছু খাটো ছিলো তাই আলখেল্লায় দেহ তাদের আবৃত থাকলেও বনহুরের চিনতে ভুল হয় না।

প্রথমা সেই অদ্ভুত মুখোশটি পরে নিলো মুখে, তারপর যানটির মধ্যে প্রবেশ করলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, যানটির আলো নিভে গেলো এবং যানটি শব্দহীনভাবে শূন্যে ভেসে উঠলো।

রাতের অন্ধকারে আর কিছুই পরিলক্ষিত হলো না।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে এলো এবং অতি দ্রুত দ্বিতীয় নারীমূর্তির পাশে এসে দাঁড়ালো।

ডেকে তখন থমথমে অন্ধকার।

দ্বিতীয়া চমকে উঠলো এবং দ্রুত রিভলভার বের করে বনহুরের বুকে চেপে ধরলো।

বনহুর অন্ধকারের স্পষ্ট দেখতে না পেলেও বেশ অনুভব করলো রিভলভারখানা নারীমূর্তি দৃঢ়হস্তে চেপে ধরেছে।

হাত দু'খানা তুলে ধরলো উপরে, তারপর বললো বনহুর–তুমি আমাকে এ মুহূর্তে হত্যা করতে পারে কিন্তু করবে না জানি, কারণ তোমার সঙ্গিনীর বিনা অনুমতিতে তুমি কিছু করতে পারবে না।

বনহুর কথার ফাঁকে চট করে নারীমূর্তির হাত থেকে রিভলভারখানা ছিনিয়ে নেয়। তারপর বলে-তোমাকে আমি এখন সাগরের বুকে নিক্ষেপ করতে পারি অথবা হত্যা করে নিঃশব্দে নিজের ক্যাবিনে ফিরে যেতে পারি কিন্তু কোনো দরকার হবে না এ সবের, শুধু আমার কথার জবাব যদি দাও?

নারীমূর্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সে ভাবতে পারেনি হঠাৎ লোকটা তাকে এভাবে আচমকা কাবু করে ফেলবে। অতি কৌশলী লোকটা, ভাবে নারীমূর্তি।

বনহুর বলে–এখানে বেশি বিলম্ব করা যায় না, কারণ তোমার সঙ্গিনীর অনুচরবৃন্দ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। তারা যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে।

এবার নারীমূর্তি কথা বললো আমি সেই প্রতীক্ষা করছি। তোমার বন্ধন মুক্ত করা আমাদের জন্য মোটেই সমীচীন হয়নি। এই মুহূর্তে তোমাকে আমি......

বনহুর ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললো–এসো আমরা আড়ালে দাঁড়াই, কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

না, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

না চাইলেও শুনতে হবে। তোমার সঙ্গিনী আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ না করলে সে আমার বন্ধনমুক্ত করে দিতো না। কাজেই তুমিও আমাকে শত্রু মনে না করে হিতাকাংখী মনে করতে পারো। কথা দাও আমার একটা কথা তুমি রাখবে।

নারীমূর্তি নীরব, কোনো জবাব সে দিলো না।

বনহুর বললো–তুমি বা তোমার সঙ্গিনী কোনোদিন কোনো বিপদে পড়লে আমি কথা দিলাম তোমাদের পাশে পাবে আমাকে। যা কথা দেবো তা পালন করবো প্রতিশ্রুতি মত। শোন, আমার সঙ্গে যাদের তোমরা চিয়াংচুর জাহাজ থেকে এ জাহাজে নিয়ে এসেছে তাদের আমি রেখে যাচ্ছি। তোমরা তাকে তাদের সঠিক স্থানে পৌঁছে দিও।

আমি জানি না।

তুমি তোমার সঙ্গীকে বলবে। কথা দাও তাকে বলবে আমার কথাগুলো।

বলবো। কিন্তু এ জাহাজ থেকে তুমি যেতে পারবে না।

তা আমি দেখবো।

কিন্তু……

না, কোনো কথা নয়। মনে রেখো, যদি ওদের কোন অযত্ন হয় তাহলে ক্ষমা করবো না।

*

প্রথমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো–আমি জানতাম সে সুযোগ পেলেই পালাবে।

সমস্ত অনুচর মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিলো। কারও মুখে কথা নেই। দ্বিতীয়া বললো–তোমাকে সব কথা বলেছি। সে আমার রিভলভার ছিনিয়ে না নিলে আমি সেই সময় তাকে বন্দী করতাম। কিন্তু আমাদের গোপন খোলের মধ্যে সাবমেরিন লুকানো ছিলো তার সন্ধান সে পেলে কি করে?

বলেছি তো তার বুদ্ধির কাছে মাঝে মাঝে আমিও হার মেনে যাই।

তুমি ছাড়া সে খোলের চাবি…

ভুল করে আমি আমার ক্যাবিনের তাকে রেখেছিলাম পোশাক পাল্টানোর সময়।

ভুল করে না ইচ্ছা করে?

এমন কথা বলবি না। ইচ্ছা করে কেউ কোনো দিন নিজের গোপন জিনিস.......বেশি কথা বলে লাভ নেই। সে যত সতর্কতার সঙ্গে আমার সাবমেরিন নিয়ে উধাও হোক না কেন আমি তাকে যে কোনো মুহূর্তে পাকড়াও করে আনতে পারি। যেমন চিয়াংচুর জাহাজে যে সে ছিলো আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম।

সত্যি!

হাঁ, সত্যি।

তবে বলোনি কেন?

কোনো দরকার হয়নি বলার।

তাহলে তুমি জানতে চিয়াংচুর জাহাজে দস্যু বনহুর স্বয়ং অবস্থান করছে?

জানতাম আর সেই কারণেই আমি বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। কারণ জলদস্যু চিয়াংচুর জাহাজে এমন একটা যন্ত্র বা মেসিন আছে যা দিয়ে সে ভুয়া সাগর থেকে সমস্ত চীন সাগর নিজের আয়ত্তে রেখেছিলো এবং হাজার হাজার যাত্রীবাহী জাহাজকে সে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ধন-সম্পদ লুট করে নিয়েছে।

সেই মেসিন নেবার জন্যই তো তুমি উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলে?

কারণ ছিলো এবং তা সফল হয়েছে। এখন চিয়াংচুর জাহাজ সেই মেসিনসহ আমার হাতের মুঠায়। জানিস ঐ মেসিন কত ভয়ংকর।

তুমি তাহলে ঐ মেসিন ব্যবহার করে বিশ্বাসীর ক্ষতি সাধন করতে চাও?

না।

প্রথমা পূর্বের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে বললো–তোমরা অপদার্থ, যাও নিজেদের কাজ করোগে। মাত্র কিছুক্ষণ ছিলাম না তারই মধ্যে......যাও তোমরা।

অনুচরগণ চলে গেলো। প্রথমা বললো–ওকে বন্দী করেও কোনো ফল হতো না। পারতে না। সে অত্যন্ত চতুর। তোমার ক্ষমতা ছিলো না কিছু করার!

দ্বিতীয়াকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললো প্রথমা।

তুমিই ভুল করেছিলে তার বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে।

হাসলো প্রথমা-বন্ধন মুক্ত না করে কোনো উপায় ছিলো না। ওর আসল পরিচয় তুমি। জানো না। কান্দাই হাঙ্গেরী কারাগারও ওকে আটকে রাখতে পারেনি।

তোমাকেই বা কোন কারাগার আটকে রাখতে পেরেছে শুনি?

দ্বিতীয়ার কথায় মৃদু হাসলো প্রথমা।

প্রথমার অনুচরগণ বিদায় গ্রহণ করার পর সে নিজ মুখের মুখোশ খুলে ফেলেছিলো।

দু'জনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা হচ্ছিলো।

বললো দ্বিতীয়া-তুমি জানতে ওকে আটক করে রাখার সাধ্য কারও নেই, তবুও তুমি কোন তার বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছিলে।

জানতাম বলেই তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম আর মুক্ত করে না দিলেও তাকে আটকে রাখতে পারতাম না। আনমনা হয়ে যায় প্রথমা।

দ্বিতীয়া বলে–সে গোপনে পালিয়ে না গিয়ে প্রকাশ্যে তোমার কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারতো.....

তুই বুঝবি না, ওর ব্যাপারে অনেক কথা আছে।

সে যাদের রেখে গেলো তাদের সম্বন্ধে কি ভাবছো?

ওদের সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া......রাজা যযাগেন্দ্রনাথ ও তার কন্যা অরুণা দেবীকে তাদের রাজ্যে পৌঁছে দিতে হবে। চিয়াংচুর অনুচর ও অন্ধ বুড়োকে আমার আশ্রয়ে জায়গা দেবো তবে এদের সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই।

তাহলে আশ্রয় দেয়া কি ঠিক হবে?

এ ব্যাপারে আমি বনহুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবো।

তাকে তুমি পাবে?

হাসলো প্রথমা, বনহুর পালিয়ে গেলেও সে তার ঠিকানা আমার কাছে রেখে গেছে……

তার মানে?

যেখানে গেছে আমি জানি এবং জানি বলেই আমি নিশ্চুপ রইলাম। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো প্রথমা, তারপর বললো–অত্যন্ত চতুর বনহুর, যাকে কেউ কোনো দিন বন্দী করে। রাখতে পারলো না।

তবে?

বিশ্ববাসীকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। আর সে কারণেই আমি বনহুরকে বন্ধনমুক্ত করেছিলাম, সে যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না করে চলে যাবার সুযোগ পায়।

তাহলে কি তুমি ইচ্ছা করেই তোমার গোপন ক্যাবিনের চাবি…।

হাঁ, আমি পোশাক পাল্টানোর সময় ইচ্ছা করেই ঐ চাবিটা তাকের উপর রেখে যাই, যেন সে সহজে আমার জাহাজ ত্যাগ করতে পারে।

তুমি মাদাম বাঈয়ের ছদ্মবেশে কান্দাই শহরে আবির্ভূত হয়েছিলে তাও সে জানে?

হাসলো প্রথমা-বলেছি তো তার কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান সে।

কিন্তু মাদাম বাঈয়ের আসল পরিচয় কি সে জানতে পেরেছে।

এবার প্রথমা নীরব।

কি, চুপ করে গেলে যে?

পরে সব বলবো তোকে। শোন আমাদের জাহাজখানা থেকে চিয়াংচুর জাহাজখানা বিচ্ছিন্ন করে নিতে বল। থাক, আমিই যাচ্ছি……প্রথমা মুখে আবরণ ঢেকে দিলো।

দ্বিতীয়াও নিজের মুখের আবরণ খুলে ফেলেছিল সেও মুখখানা আবরণে ঢেকে নিলো।

বেরিয়ে এলো ওরা ক্যাবিন থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী কুর্ণিশ জানালো।

প্রথমা বললো–রণজিৎ সিংকে বলল আমি ডাকছি।

প্রহরী পুনরায় কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান করলো।

ডেকের উপরে রক্ষিত লৌহ আসনে উপবেশন করলো প্রথমা। দ্বিতীয়া দাঁড়িয়ে রইলো পাশে।

প্রহরী আর রণজিৎ সিং এসে হাজির হলো সেখানে।

কুর্ণিশ জানালো প্রথমাকে।

রণজিৎ সিং এই জাহাজের দায়িত্বে আছে, তার আয়ত্তে রয়েছে পঞ্চাশজন অনুচর। সবাই বীর যোদ্ধা, আর শক্তিশালী। রণজিৎ সিংয়ের চেহারা বলিষ্ঠ জোয়ান, তাকে দেখলে যে কোনো ব্যক্তি ভীত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বয়স তার কম নয়, পঞ্চাশের কাছাকাছি। মুখে এবং মাথায় রাশিকৃত কাঁচা-পাকা চুল। চোখ দুটি বেশ বড় এবং রক্তাভ। বলিষ্ঠ চওড়া মাংসপেশীযুক্ত বক্ষ। কণ্ঠস্বরও তেমনি গম্ভীর। এ জাহাজে সবাই যেমন তাকে ভয় করে, তেমনি তার প্রতি সবাই সন্তুষ্ট।

কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়াতেই বললো প্রথমা-চিয়াংচুর জাহাজখানা চীন সাগরের মোহনায় তলিয়ে দাও। কেউ যেন কোনোদিন চিয়াংচুর চুম্বক মেসিনের সন্ধান না পায়।

এ আপনি কি বলছেন! অবাক কণ্ঠে বললো রণজিৎ সিং। তার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। রণজিং সিং ভেবে পায় না হঠাৎ এমন নির্দেশ তাকে দেয়ার কারণ কি। অনেক দিনের প্রচেষ্টায় তারা সফলকাম হয়েছে। বহুদিন ধরে রণজিৎ জলদস্যু চিয়াংচু ও তার চুম্বক মেসিনের সন্ধান করে ফিরছে। এতদিনে খুঁজে পেয়েছে তারা তাদের আকাঙিক্ষত বস্তু কিন্তু দলনেত্রীর এ কি আদেশ।

বললো প্রথমা-কি ভাবছো

রণজিৎ রণজিৎ চোখ তুলে তাকালো প্রথমার কাপড়ে ঢাকা মুখখানার দিকে, বিস্ময়ভরা গলায় বললো–যে চুম্বক মেসিনের জন্য আমরা দীর্ঘ দিন ধরে চীন সাগর হতে ভুয়া সাগর চষে ফিরেছি সেই চুম্বক মেসিন..

রণজিৎ সিংয়ের কথা শেষ হয় না, বলে উঠলো প্রথমা-হাঁ হাঁ রণজিৎ, ঐ চুম্বক মেসিন আমি ধ্বংস করে দেবো। আমি চাই না ওটা আমার বা অন্য কারও করায়ত্ত হোক। বনহুরের মুক্তির কারও তোমাদের জানা উচিত, তাকেও আমি স্বেচ্ছায় মুক্ত করে দিয়েছি। যাও আমার নির্দেশ, তোমরা চীন এবং ভুয়া সাগরের মোহনায় যেখানে সবচেয়ে গভীরতা বেশি সেখানে তলিয়ে দাও।

আচ্ছা, আপনার নির্দেশমতই কাজ হবে। তবে আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনি কেন এমন নির্দেশ দিলেন?

আলখেল্লার মধ্যে হাসির শব্দ হলো, বিস্ময়কর সে হাসির প্রতিধ্বনি হাসি থামিয়ে বললো প্রথমা-জানি এ প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক। রণজিৎ, তুমি নতুন নও। তুমি ভালভাবেই জানো আমি অহেতুক তোমাদের কোনো নির্দেশ দেই না। আমার কাজ উদ্দেশ্যবিহীন নয়, জলদস্যু চিয়াংচু ঐ চুম্বক মেসিন দ্বারা শত শত জাহাজ ধ্বংস করেছে। হাজার হাজার মানুষকে সে হত্যা করেছে। আমি চাই না ঐ চুম্বক মেসিন আমি ব্যবহার করি। একটু থেমে বললো প্রথমা-এবার তোমার মনে কোনো দ্বিধা থাকবে না রণজিৎ। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে প্রথমা, তারপর আপন মনেই বললো–বহুদিন ধরে আমি এই নরপশু চিয়াংচুকে খুঁজে ফিরেছি তোমরা তা জানো। শুধু এই কারণেই আমার এ সংগ্রাম। আমি এখন নিশ্চিন্ত রণজিৎ! আর আমাকে ভাবতে হবে না। তোমাদেরও কোন হয়রানি করবে না এই ব্যাপারে। তোমরা তো জানো আমি চাই না অহেতুক কেউ কারও ওপর নিষ্পেষণ চালাক।

জানি। আর জানি বলেই তো আমরা আপনার সব আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করি। রণজিৎ একটু থেমে মাথা চুলকে বললো–একটা কথা বলবো, যদি অপরাধ না ধরেন?

বলো?

বনহুরকে আপনি সব সময় সমীহ করে চলেন।

হাঁ, রণজিৎ সত্যি তাই। তাকে আমি শুধু সমীহ করি না, মনে মনে শ্রদ্ধা করি। এ পৃথিবীতে সে এক বিস্ময়কর ব্যক্তি।

তাই বলে আপনার চেয়ে সে বড় নয়।

কোন দিকে দস্যুতায় না হৃদয়তায়।

দুদিকেই সে কি আপনার চেয়ে.....

আমি মনে করি সে আমার চেয়ে অনেক বেশি দুদিকেই।

এ আপনি কি বলছেন!

হাঁ, যা সত্য তাই বলছি।

না, আরা তা বিশ্বাস করি না-আপনি নারী হলেও বনহুরের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং হৃদয়বতী......।

এখানে যখন বিস্ময়কর নারী তার জাহাজে নিজ অনুচরদের সঙ্গে কথা বলছিলো তখন বনহুর তার আস্তানায় বসে রহমানসহ তাদের সব কথা শুনছিলো।

বনহুর অর্ধশায়িত অবস্থায় আর রহমান একটি পাথরখন্ডে বসে ছিলো। উভয়ের মুখমন্ডল হাস্যোজ্জ্বল। বনহুর ঐ জাহাজ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে তাদেরই একটি ক্ষুদ্র ওয়্যারলেস যন্ত্র রেখে এসেছিলো এক আসনের নিচে, তাই তারা কেউ দেখতে পায়নি এবং নিশ্চিন্তভাবে কথাবার্তা বলছিলো। বনহুরের উদ্দেশ্য ছিলো তাদের জাহাজের গোপন রহস্য জেনে নেয়া, তাই বনহুর চলে আসার পর তার আস্তানায় নিজের অদ্ভুত ওয়্যারলেস মেসিনের সামনে

বসেছিলো। ওদের মধ্যে যা কথাবার্তা হচ্ছিলো সব শুনছিলো বনহুর আর রহমান।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির আভাস।

রহমান বললো–সর্দার, মহিলা যা বলছে তা সত্য কিন্তু পুরুষটি কে, যার কণ্ঠস্বর আর অহংকারপূর্ণ কথা আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

বললো বনহুর–রহমান, পুরুষ কণ্ঠস্বরটি যার সে এ নারীর নৌবাহিনী অনুচরদের প্রধান। নাম রণজিৎ সিং, বড় মহত ব্যক্তি সে।

সর্দার, আপনার সম্বন্ধে যে এমন উক্তি উচ্চারণ করতে পারে তাকে আপনি মহৎ ব্যক্তি বলছেন?

হাঁ রহমান, সে সত্যি মহৎ ব্যক্তি, এ কথা আমি স্বীকার করছি। একটু থেমে বললো বনহুর–রহমান, তুমি আমার প্রধান অনুচর এবং সহকারী বন্ধু ও বটে। তুমি কি কোনোদিন স্বীকার করবে তোমার সর্দার অন্য কারও চেয়ে দুর্বল বা খাটো?

মাথা নিচু করলো রহমান।

বনহুর বলে চলেছে-কেউ তার নেতা বা নেত্রীকে কারও চেয়ে দুর্বল মনে করে না, করতে পারে না। হাঁ, আর একটি কথা রহমান, তুমি ঐ নারীকে চেনো না! তার পরিচয় জানো না।

জানি সর্দার তার আসল পরিচয়, সে মাদাম বাঈ......

সেটাও তার ছদ্মনাম......

সর্দার!

হাঁ, রহমান।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওপাশ থেকে শোনা গেলো ওয়্যারলেসে নারীকণ্ঠ......যাও রণজিৎ, যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দিলাম সেইভাবে চুম্বক মেসিনসহ ঐ

জাহাজখানা তলিয়ে দাওগে। তোমরা জাহাজ থেকে সাবমেরিনসহ বহুদূরে থাকবে...

পুরুষকণ্ঠ......আপনার নির্দেশ পালন করবো।

...শোন রণজিৎ, জাহাজখানা বিধ্বস্ত করবার পূর্বে চুম্বক মেসিনটা সম্পূর্ণ অকেজো করে দিতে হবে, যেন কোনো জাহাজ ঐ স্থান অতিক্রম করবার সময় বিপদগ্রস্ত না হয়।

...ঠিক মতই কাজ করবে কিন্তু...

...বল থামলে কেন......

...এতো মূল্যবান মেসিনটা বিনষ্ট না করে রাখলে হয় না?...

...না, আমি যা বললাম সেইমত কাজ করবে। আমি চাই না ঐ চুম্বক মেসিন আর একটিও প্রাণীর ক্ষতি সাধন করে......

হঠাৎ অফ হয়ে গেলো, আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো।

রহমান বললো–সর্দার ওরা কি তাহলে ওয়্যারলেস মেসিনটা দেখে ফেলেছে?

না রহমান। ওয়্যারলেস মেসিনটার শব্দ গ্রহণ ক্ষমতা লোপ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এবার বনহুর একটি সিগারেট তুলে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো। তারপর বললো–রহমান, এই নারী সাধারণ নয়.....

তার মানে ঐ মাদাম বাঈ, যে কান্দাই এসেছিলো আহসান হাবীবকে হত্যা করার জন্য...

আসলে সে বাঈজী নয়-তার বিরাট প্রতাপ আছে। হাঁ, তাকে একজন জনহিতাকাংখী নারী বলতে পারো। একটু থেমে বললো বনহুর–তুমি তাকে চেনো এমন কি দেখেছোও বটে।

আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না সর্দার। কে এই মাদাম বাঈ যার পরিচয় আপনি জানেন!

তবে শোন আমি বলছি, তার আসল পরিচয়...

ঐ মুহূর্তে হাঁপাতে হাঁপাতে কক্ষে প্রবেশ করে কায়েস। তার সমস্ত দেহ রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। ধপ করে বসে পড়ে মেঝের উপর।

বনহুর আর রহমান বিস্ময় নিয়ে তাকায় তার দিকে।

বনহুর বলে উঠলো–তোমার এ অবস্থা কেন কায়েস? তাড়াতাড়ি ওর পাশে বসে কাঁধে হাত রাখে সে।

রহমানও এসে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

কায়েস কিছু বলবার চেষ্টা করে-সর্দার, নূরকে একদল শয়তান লোক ধরে... নিয়ে যাচ্ছিলো,...

নূর! কোথায়-কোথায় নূর? বললো বনহুর।

আমি...নূর...কে মুক্ত করে এনেছি...কিন্তু...তার অবস্থা... শো... চ... নী... য়.. শি... গ... গির...বলতে পারে না কায়েস, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে সে।

রহমান আর বনহুর কায়েসকে ধরে ওপাশের শয্যায় তুলে শুইয়ে দেয়। বনহুর বলে-রহমান, তুমি ওর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করো, আমি দেখছি...বেরিয়ে গেলো বনহুর।

কক্ষ হতে বেরিয়ে আসতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো নূরী। তার সঙ্গে একজন অনুচর। নূরী বনহুরকে লক্ষ করে বললো–একটি তরুণকে কায়েস কাঁধে করে নিয়ে এসে তোমার বিশ্রামকক্ষে শুইয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো। কোথায় যে গেলো জানি না-তার সমস্ত শরীরে রক্তের ছাপ রয়েছে। আর তরুণটিই বা কে। চলো শিগগির চলল, দেখবে এসো।

অনুচরটির শরীরের স্থানে স্থানে রক্তের দাগ। তার মুখমন্ডল স্নান, উদ্বিগ্ন। কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–সর্দার, কায়েস ভাই কান্দাই পর্বতমালার পাদদেশ থেকে

তার অশ্বপৃষ্ঠে এ তরুণকে নিয়ে এসেছে...আমি পথে তাকে দেখি এবং তাকে সহায়তা করি। আমি না থাকলে কায়েস ভাই আস্তানায় পৌঁছতে পারতো কিনা সন্দেহ।

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে নিজ বিশ্রামকক্ষের দিকে এগুলো।

নূরী এবং অনুচরটি তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলো, তার শয্যায় শায়িত নূর রক্তে শয্যা ভিজে উঠেছে।

নূরী স্বামীর মুখোভাব লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলো। কায়েস যখন নূরকে সোজাসুজি বনহুরের বিশ্রামকক্ষে এনে তারই শয্যায় শয়ন করিয়ে দিলো তখন নূরী ভীষণ অবাক হয়ে বলেছিলো, কায়েস, তুমি এ কি করছো? কাকে তুলে এনে তুমি তোমার সর্দারের শয্যায় শয়ন করালে? কে এই তরুণ? আর তোমার অবস্থাই বা এমন কেন?

কায়েস অর্ধ সংজ্ঞাহীনের মত শুধু বলেছিলো, সব পরে জানতে পারবে...... তারপর কায়েস বেরিয়ে গিয়েছিলো ক্ষিপ্তের মত। অবশ্য তার সঙ্গী অনুচরটি বলেছিলো-কায়েস ভাই এই তরুণকে কান্দাই পর্বতমালার পাদদেশ থেকে তুলে এনেছে......এর বেশি সেও তখন বলতে পারেনি। এ মুহূর্তে নূরী ভীষণ বিস্মিত হলো। তবে কি তার স্বামী ওকে চেনে?

বনহুর সযত্নে নূরের মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে ভালভাবে লক্ষ করতে লাগলো। মাথার মধ্যে কিছু অংশ থেতলে গেছে, সেই স্থান হতে প্রচুর রক্ত ঝরছে। সমস্ত জামাকাপড় লালে লাল হয়ে গেছে। বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ নূরের সংজ্ঞাহীন মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নূরীর পাশে দন্ডায়মান অনুচরটিকে লক্ষ্য করে বললো–তুমিও কি কায়েসের সঙ্গে কান্দাই পর্বতমালায় গিয়েছিলে?

না, আমি যাইনি। আমি আস্তানার অদূরে ফুল্লরা আর জাভেদের সন্ধানে গিয়েছিলাম। তারা কান্দাই জঙ্গলে হরিণ শিকারে গিয়েছে কিন্তু এখনও ফিরে আসেনি।

নূরীও অনুচরটির কথায় যোগ দিয়ে বললো–হাঁ হুর, জাভেদ আর ফুল্লরা অনেক ভোরে শিকারে গেছে, এখনও ফিরে আসেনি। বৃদ্ধা দাইমা চোখে দেখে না তবু সে সব খোঁজ রাখে। লাঠি ধরে ধরে আস্তানার খিড়কিপথে বাইরে গিয়ে ওকে তাদের খোঁজে পাঠিয়েছিলো।

বললো অনুচরটি–হাঁ, দাইমাই আমাকে পাঠিয়েছিলো। আমি আমার অশ্ব নিয়ে গোটা কান্দাই জঙ্গল চষে ফিরছিলাম এমন সময় শুনতেই পাই অশ্ব পদশব্দ। সতর্ক হয়ে তাকাই, মনে করি কোনো শত্রুদলের লোক হয়তো আমাদের আস্তানার সন্ধানে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ধারণা পাল্টে গেলো। আমি দেখলাম কায়েস ভাই একটি রক্তাক্ত তরুণকে অশ্বপৃষ্ঠে ধরে নিয়ে এগিয়ে ছুটে আসছে। তারও সমস্ত দেহ রক্তমাখা। আমি সামনে এসে দাঁড়ালাম।

তারপর? বললো বনহুর।

কায়েস অশ্ব থামিয়ে বললো–নাদিম, তুমি শিগগির আমার পেছনে উঠে বসো এবং আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো আমি যেন পড়ে না যাই। আমি তাকে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না, কারণ তার যে অবস্থা আমি দেখলাম তা আমাকে হতবাক করে ফেলেছিলো। আমি তার কথামত কাজ করলাম। তার অশ্বপৃষ্ঠে আমি চেপে বসে তাকে ধরে রাখলাম। অশ্ব ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর গভীর উদ্বিগ্নতা নিয়ে শুনছিলো।

নাদিম বলছে-সর্দার, কায়েস ভাইয়ের খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তার কাঁধে একটি গভীর জখম ছিলো, তা থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিলো। দেহের বিভিন্ন স্থানেও আঘাতের চিহ্ন ছিলো। অতিকষ্টে কায়েস ভাই আর এই তরুণসহ আমি আস্তানায় এসে পৌঁছাই। আমি আর কায়েস ভাই তরুণটির সংজ্ঞাহীন দেহ আস্তানার মধ্যে নিয়ে আসি এবং আপনার শয্যায় শুইয়ে দেই। জানি না সর্দার কায়েস ভাই তাকে কেন এমন করে আপনার বিশ্রামকক্ষে নিয়ে এলো।

শোন নাদিম, তুমি শীঘ্র আমার ডাক্তার রতন লালকে নিয়ে এসো। যাও বিলম্ব করো না। রতনলাল এখন তার অনাথ আশ্রমে রয়েছেন।

আচ্ছা সর্দার যাচ্ছি। বেরিয়ে যায় নাদিম।

নূরী বললো–হুর, এই সংজ্ঞাহীন তরুণ কে? তুমি একে চেনো?

বনহুর বললো–হাঁ, আমিই শুধু চিনি না, তুমিও চেনো।

আমি চিনি! অবাক কণ্ঠে বললো নূরী।

বনহুর নূরের সংজ্ঞাহীন চিবুকটা ধরে বললো–ভাল করে তাকিয়ে দেখো নূরী চিনতে পারো কিনা।

নূরী সরে এসে ভাল করে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো-একি! এ যে নূর! নূরের এ অবস্থা কেন?

সবই তো নাদিমের মুখে শুনলে। যাও নূরী, শিগগির পানি আর কিছু তুলো নিয়ে এসো। যতক্ষণ ডাক্তার রতন লাল না আসে ততক্ষণ ওর সংজ্ঞা ফেরানোর চেষ্টা করো। না জানি কিভাবে ওর এমন অবস্থা হয়েছে।

আহা, কে ওর এমন অবস্থা করেছে হুর?

জানি না। গভীর চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললো বনহুর।

নূরী কিছু পানি আর তুলে নিয়ে এলো।

বনহুর আর নূরী উভয়ে নূরের সংজ্ঞা ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

*

এই, দুধ খেয়ে নাও।

নূর শয্যায় বসে তাকালো নূরীর মুখের দিকে।

নূরীর হাতে দুধের গেলাস। ক’দিন পর নুর আজ অনেকটা সুস্থ। ডাক্তার রতনলালের ওষুধের গুণে এবং নূরীর সেবাযত্নে অনেকটা আরোগ্য লাভ করেছে নূর। রতনলাল সেই সেদিনের পর থেকে তার সর্দারের আস্তানা ছেড়ে অনাথ আশ্রমে যেতে পারেনি। সব সময় নূরের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

ডাক্তার রতন লাল কাছেই ছিলেন, এগিয়ে এলেন নূরকে শয্যায় উঠে বসতে দেখে। কদিন নূরের শয্যায় উঠে বসার ক্ষমতা ছিলো না, ভীষণ রক্তপাত হওয়ায় বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলো সে। বনহুর অবশ্য নুরের সংজ্ঞা ফিরে আসার পর আর

সামনে আসেনি, কারণ নূর যেন এ সময় কিছু নিয়ে গভীরভাবে না ভাবে এটাই তার লক্ষ্য ছিলো। সব সময় আড়ালে থেকে খোঁজখবর নিয়েছে, এমন কি ফলমূল সব সংগ্রহ করে দিয়েছে বনহুর নূরীর হাতে।

সংজ্ঞা ফেরার পর নূর বিস্ময় নিয়ে বলেছিলো, আমি এখন কোথায়?

পাশে ছিলেন রতন ডাক্তার, নূরকে শুইয়ে দিয়ে বললেন-তুমি আরোগ্য লাভ করলে সব জানতে পারবে।

নূরী অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো নূরের মুখের দিকে। কত স্মৃতি তার মনের পর্দায় ভেসে উঠছিলো, একদিন শিশু নূরকে পেয়ে নূরী তার প্রিয় হুরকে ভুলে গিয়েছিলো, নূর ছিলো তার জীবনের ধন, নয়নের মণি। নূরকে যখন হুর তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলো নূরী তখন সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকার দেখে ছিলো। আজ সেই নূর তার এত কাছে, তার চোখের সামনে। কিন্তু আজ আর নূরের প্রতি তার তেমন কোন আকর্ষণ নেই।

শুধু রয়েছে একরাশ বিস্ময়।

[পরবর্তী বই বনহুর ও মাদাম বাঈ (২)]

পূর্ববর্তী:

« ৮.০৭ বিস্ময়কর গুহা

পরবর্তী:

৮.০৯ বনহুর ও মাদাম বাঈ (২) »